বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

Educational Administration and Management in Bangladesh-1

কোর্স কোড-EDM-2354

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This book is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

MEd PROGRAMME

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

রচনা

ড. এম এ ওহাব
সেলিনা আক্তার
ড. সুনীল কান্তি দে

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এম এ ওহাব
অধ্যাপক ও ডীন (প্রাক্তন)
স্কুল অব এডুকেশন
তবারক উল ইসলাম (প্রাক্তন)
অধ্যাপক
স্কুল অব এডুকেশন
সেলিনা আক্তার
সহযোগী অধ্যাপক
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
EDM PROGRAMME

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

(সকল স্বত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
পূনমুদ্রণ : ২০০৪, ২০০৫
পূনমুদ্রণ : ২০১১

প্রচ্ছদ ডিজাইন
কাজী সাইফুদ্দিন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ এন্ড পেইজ লে-আউট
মির্জা শাহাজাদা ঈমরান

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১/ক, হেমেন্দ্র দাস রোড,
ঢাকা-১১০০

ISBN-984-34-0049-6

কোর্স বই অনুসরণ করার কার্যকর পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

উন্মুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর এমএড শিক্ষা প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য স্কুল অব এডুকেশন আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১ (EDM-2354) কোর্স বইটি এমএড প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি বিশেষায়ন ক্ষেত্রের কোর্স বই। এই কোর্সের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কয়েকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা লাভে আপনাকে সহায়তা করা। আশা করা যায়, আপনি এ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সম্যকরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।

এ কোর্স বইটির বিষয়বস্তুতে মূলত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক চিত্র বিভিন্ন পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আপনি যদি এগুলো মনোযোগসহকারে পাঠ করেন তবে এতদবিষয়ে একটি সামগ্রিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভে সমর্থ হবেন।

EDM 2354 কোর্সবই

পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মুল কথাই হল নিজে পড়ে শেখা এবং নিজের চেষ্টায় শেখা। অন্য কথায়, এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্ব নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। বস্তুত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্কুল অব এডুকেশন এর বিভিন্ন কোর্সের বইগুলো রচিত। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলো কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ প্রাথমিকভাবে একবার পড়তে আপনার ৪০-৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এ জন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর প্রশ্নমালা রয়েছে।
- কোর্সবই পড়ার সময় কী কী কাজের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে?
  - ❑ পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন। আপনার উত্তরগুলো সঠিক হল কিনা, তা পাঠের শেষে দেওয়া "সঠিক উত্তর" দেখে যাচাই করে নিন।
  - ❑ পাঠোত্তর মূল্যায়নের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী ইউনিট এগিয়ে যান।
  - ❑ আপনার উত্তরগুলো সঠিক না হলে পাঠগুলো পড়ুন। পড়া শেষে হলো পাঠোত্তর মুল্যায়ন প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন। উত্তর সঠিক হলে পড় পড় পাঠে এগিয়ে যান।
  - ❑ কোন পাঠে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সে পাঠের নির্দিষ্ট অংশ আবার পড়ুন। এভাবে প্রতিটি ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করুন।

বইটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল:

উদ্ধৃতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ বিরতি

সঠিক উত্তর

- **পাঠ সহায়ক কর্মসূচি**

এই বইটি ছাড়াও স্কুল অব এডুকেশন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত স্থানীয় এম এড টিউটোরিয়াল সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে (২য়-৪র্থ অথবা ১ম-৩য় শুক্রবার) দুটি টিউটোরিয়াল সেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সেশনে যোগ দিয়ে আপনি বইটির কোন অংশ বা পাঠ পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।

রেডিও ও টিভিতে প্রতি সপ্তাহে আপনার জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তুভিত্তিক সহায়ক সেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি নির্ধারিত সময়ে ঘরে বসে এসব সেশনে অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আপনার ধারণা সমৃদ্ধ করতে পারেন।

সূচিপত্র

পাঠ		পৃষ্ঠা
ইউনিট-১ : বৃটিশ ভারতে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা		**০১**
পাঠ-১.১	দেশীয় শিক্ষা : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	০২
পাঠ-১.২	উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪): শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	০৫
পাঠ-১.৩	হান্টার কমিশন (১৮৮২) : শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা	০৯
পাঠ-১.৪	ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১৩
পাঠ-১.৫	লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১৬
পাঠ-১.৬	স্যাডলার কমিশন (১৯১৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২০
পাঠ-১.৭	হার্টগ কমিটি রিপোর্ট (১৯২৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২৩
পাঠ-১.৮	উড-এবট রিপোর্ট (১৯৩৭) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২৬
পাঠ-১.৯	বুনিয়াদী শিক্ষা : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২৯
পাঠ-১.১০	সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১	৩২
পাঠ-১.১১	সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-২	৩৫
ইউনিট ২ : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা		**৩৮**
পাঠ-২.১	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	৩৯
পাঠ-২.২	পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	৪২
পাঠ-২.৩	পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন	৪৬
ইউনিট ৩ : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা		**৪৯**
পাঠ-৩.১	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা	৫০
পাঠ-৩.২	প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির বক্তব্য	৫৩
পাঠ-৩.৩	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	৫৮
পাঠ-৩.৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের প্রশাসনিক ক্ষমতা	৬৩
পাঠ-৩.৫	ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	৬৫
ইউনিট ৪ : মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা		**৬৯**
পাঠ-৪.১	মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো	৭০
পাঠ-৪.২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৩
পাঠ-৪.৩	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	৭৭
পাঠ-৪.৪	মাউশির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্যদের দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা	৮৪
পাঠ-৪.৫	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ড	৮৮
পাঠ-৪.৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	৯৩
পাঠ-৪.৭	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	৯৮
পাঠ-৪.৮	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী	১০২
পাঠ-৪.৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো	১০৬
পাঠ-৪.১০	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	১০৯
পাঠ-৪.১১	মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	১১৪
পাঠ-৪.১২	মাদ্‌রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১১৯

পৃষ্ঠা

ইউনিট ৫ : বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ১২৪
পাঠ-৫.১ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ১২৫
পাঠ-৫.২ বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্নিং বডি ১৩০
ইউনিট ৬ : মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা ১৩৫
পাঠ-৬.১ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও সমাধান ১৩৬

পাঠ ৭ : বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ১৪২
পাঠ-৭.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিকাশ ও প্রশাসনিক কাঠামো ১৪৩
পাঠ-৭.২ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা ১৪৭
পাঠ-৭.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্ল্যানিং ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ক্ষমতা ১৫১
পাঠ-৭.৪ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোকেশনাল শিক্ষা), পরিচালক (পিআইইউ) ও পরিচালক (পিআইডব্লিউ) এর কর্তব্য এবং ক্ষমতা ১৫৩
পাঠ-৭.৫ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা ১৫৬

ইউনিট ৮ : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৫৯
পাঠ-৮.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ১৬০

ইউনিট ৯ : জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ ১৬৪
পাঠ-৯.১ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ ১৬৬
পাঠ-৯.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ ১৭১
পাঠ-৯.৩ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ ১৭৭

ইউনিট ১০ : পরীক্ষা ব্যবস্থা : বর্তমান অবস্থা ও গতিধারা ১৮২
পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও সংস্কারের সুপারিশ ১৮৩
পাঠ-১০.২ পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিক গতিধারা ১৮৮

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

Educational Administration and Management in Bangladesh-1

কোর্স কোড-EDM-2354

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MEd PROGRAMME

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

রচনা

ড. এম এ ওহাব
সেলিনা আক্তার
ড. সুনীল কান্তি দে

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এম এ ওহাব
অধ্যাপক ও ডীন (প্রাক্তন)
স্কুল অব এডুকেশন
তবারক উল ইসলাম (প্রাক্তন)
অধ্যাপক
স্কুল অব এডুকেশন
সেলিনা আক্তার
সহযোগী অধ্যাপক
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট ১

বৃটিশ ভারতে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
[Educational Management and Administration in British India]

ভূমিকা

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত ডেসপ্যাচ, কমিশন, কমিটি, রিপোর্টের নিকট অনেকটা ঋণী। কারণ এতদ অঞ্চলে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তা মূলত ঐসব কমিটির শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা। নিম্নে বৃটিশ ভারতে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ১১টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ-১.১ : দেশীয় শিক্ষা : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.২ : উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৩ : হান্টার কমিশন (১৮৮২) : শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৪ : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৫ : লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৬ : স্যাডলার কমিশন (১৯১৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৭ : হার্টগ কমিটি রিপোর্ট (১৯২৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৮ : উড-এবট রিপোর্ট (১৯৩৭) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৯ : বুনিয়াদী শিক্ষা : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.১০ : সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১
পাঠ-১.১১ : সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-২

পাঠ-১.১ দেশীয় শিক্ষা : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দেশীয় শিক্ষা কি এবং এ সঙ্গে ইংরেজ শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিবর্গের দেশীয় শিক্ষার স্বরূপ অনুসন্ধানের বিষয়টি জানতে পারবেন;
- উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টের আলোকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপানার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- দেশীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে উইলিয়াম অ্যাডামের প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে এদেশে ইংরেজ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মকলহে মুসলিম রাজশক্তি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে প্রবেশ করে। এ সময়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা কেন্দ্রিক দেশীয় ঐতিহ্য ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইংরেজগণ দেশীয় শিক্ষা নামে অভিহিত করে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন চিন্তা করেনি, ভারতীয় জনসাধারণও এ সময়ে জাতীয় শিক্ষার দাবী তুলতে পারেনি। তবে ইংরেজ শিক্ষাব্রতী টমাস মনরো (মাদ্রাজের গভর্নর), এলফিনস্টোন (বোম্বাইয়ের গভর্নর) এবং উইলিয়াম অ্যাডাম (মিশনারী) ভারতের জন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা রচনার পূর্বে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ চিহ্নিত করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষার স্বরূপ অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হন। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বৎসরের চেষ্টায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি তিনটি (১লা জুলাই ১৮৩৫, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৫ এবং ২৮ শে এপ্রিল ১৮৩৮) রিপোর্ট পেশ করেন। এসব রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যে স্বরূপটি পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-(১) প্রাথমিক শিক্ষা এবং (২) উচ্চ শিক্ষা। বর্তমানের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বলে কিছু ছিল না।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল। স্তর ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়াগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১) প্রথম স্তর : প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে মাটির উপরে অক্ষর লেখার অভ্যাস তৈরি করার উপর গুরত্ব আরোপ করা হত।

২) দ্বিতীয় স্তর : প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর শুরু হত অক্ষরগুলোর আকার সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা সৃষ্টি নিয়ে। এ সময়ে বাংলাদেশে তালপাতায় এবং বিহারে কাঠের উপর অক্ষর লেখা শেখানো হত।

৩) তৃতীয় স্তর : প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় স্তর শুরু হত পড়া এবং লেখা একসঙ্গে আয়ত্ত করার মধ্যে দিয়ে। 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক এই সময় পড়ানো হত। সঙ্গে চলত গণিত, নাম্‌তা, কাঠাকিয়া এবং সের, ছটাক প্রভৃতি দেশীয় ওজন পদ্ধতি শেখানো।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা দুই নামে বিভক্ত ছিল। হিন্দু শিক্ষার্থীর জন্য টোল আর মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য ছিল মাদ্‌রাসা।

টোল : উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল। দেশের ধনী ব্যক্তিবর্গ উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দান করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হত, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকগণ নিজগৃহে শিক্ষার্থীদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষকবৃন্দ নিজগৃহে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় বা চণ্ডীখানায় বা চন্ডীমণ্ডপে শিক্ষকতা করতেন।

মাদ্‌রাসা : আরবী-ফারসী মাদ্‌রাসাগুলোর অবস্থান ছিল সাধারণত মসজিদের পাশে বা মসজিদে। মাদ্‌রাসার অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন মুসলমান। তবে ফারসী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হিন্দু শিক্ষকও ছিলেন। সে সময়ে সরকারি ভাষা ফারসী ছিল বলে চাকুরীর জন্য হিন্দু কায়স্থরা ফারসী ভাষা শিখত। মাদ্‌রাসা ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল।

উচ্চ শিক্ষার পরিধি

বস্তুত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। খুব কম সংখ্যক লোকই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত। আর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল।

উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর তৃতীয় রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব রেখেছিলেন তা আলোচনা করা হল।

পরিকল্পনা গ্রহণ

প্রথম পর্যায়ে এক বা একাধিক জেলাকে নির্বাচিত করে পরীক্ষামূলকভাবে একটি পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রধান কর্মকর্তা ও তাঁর কার্যাবলি

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি জেলায় একজন করে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান কর্মকর্তা (অ্যাডাম তাকে Examiner বলে উল্লেখ করেছেন) নিয়োগ করতে হবে। তিনি নিজ নিজ অঞ্চলে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন, শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষা পদ্ধতি

জেলা প্রধান কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার সম্বন্ধে নানা প্রকার পরীক্ষা পরিচালিত হবে।

পরীক্ষা পরিচালনা ও পারিতোষিক দান

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক দানের ব্যবস্থাও প্রদান কর্মকর্তাদের অন্যতম কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার প্রদান

শিক্ষকদিগকে বিনামূল্যে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি দেওয়া হবে। অবসর সময়ে তাঁরা এইগুলো পাঠ করবেন এবং বছরে নির্দিষ্ট সময়ে এই বিষয়ে তাঁদের পরীক্ষা দিতে হবে। যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁদের জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্ত প্রশিক্ষণরত শিক্ষকগণ বছরে এক থেকে তিন মাস পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন, অবশিষ্ট সময়ে তারা বিদ্যালয়ে কাজ করবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চার বছর কাল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকগণ বৃত্তিগত মান বৃদ্ধি করবেন।

স্কুলের জন্য জমির ব্যবস্থা

দেশীয় স্কুলগুলোকে প্রয়োজনীয় জমি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করবেন।

দেশীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে উইলিয়াম অ্যাডামের সুপারিশ সমকালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বড় লাটের নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর প্রধান লর্ড মেকলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান

নেন। ফলে ইংরেজ সরকার দেশীয় শিক্ষা বাতিল করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করেন। যদিও তৎকালীন শাসকগণ অ্যাডামের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য মনে করেননি তথাপি পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তাঁর নীতিকে অস্বীকার করতে পারেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দেশীয় শিক্ষা কত বিভক্ত ছিল?

২. দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্তর কয়টি ও কি কি?

৩. দেশীয় উচ্চ শিক্ষা কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

৪. জেলার শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব কি ছিল?

৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অ্যাডামের সুপারিশ কি ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ বর্ণনা করুন।

২. উইলিয়াম অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।

পাঠ-১.২ উড-এর ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন ও জনশিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি ও তাঁর প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভারতে প্রথমবারের মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- উডের ডেসপ্যাচে উল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াবলি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নারী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি আলোচনা করতে পারবেন ।

ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলি নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল তন্মধ্যে উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ (Wood's despatch) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কারণ পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থানায় যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সবকিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । উডের শিক্ষা নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি শিক্ষার নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় । এক কথায় বলা যায় স্বাধীন ভারতে, ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলা এবং বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলে ।

উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা, জনশিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, বৃত্তি শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর সুপারিশ পেশ করেছিল ।

শিক্ষা বিভাগ ও জনশিক্ষা অধিকর্তা

ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নতুন পরিকল্পনাটি (New Scheme) প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । পরিকল্পনার প্রথমাংশে ছিল পৃথক শিক্ষা বিভাগের কথা । তখন ভারতবর্ষে কোম্পানী অধিকৃত স্থান বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে বিভক্ত ছিল । এসব স্থানে ছিল প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড এবং কাউন্সিল অব এডুকেশন । এক একটি প্রদেশের শিক্ষার ভার কয়েকজন মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত এক একটি বোর্ড বা কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত ছিল । ফলে শিক্ষা প্রশাসনে কোন সংহতি ছিলনা । তাই নতুন পরিকল্পনায় সমস্ত প্রদেশ থেকে শিক্ষা বোর্ড বা কাউন্সিল তুলে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য পৃথক শিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন করার সুপারিশ করা হয় । এই বিভাগ পরিচালিত হবে জনশিক্ষা অধিকর্তার (Director of Public Instruction) দ্বারা । তার অধীনে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক (Inspector) । পরিদর্শকগণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করবেন । এই ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয়করণের নীতি প্রবর্তিত হয় ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে উচ্চ শিক্ষা পরিবেশন ও পরিচালনার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তাই উড ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাব ছিল ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। উল্লেখ্য কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব তখন অগ্রাহ্য করা হয়। তাই ডেসপ্যাচে প্রস্তাব করা হয় যে ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও কার্যাবলি

সরকার মনোনীত একজন আচার্য, একজন উপাচার্য এবং কয়েকজন ফেলো দিয়ে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিনেট গঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি দানই হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান কাজ। ডেসপ্যাচে অবশ্য আইন-শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, সংস্কৃত চর্চা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে বিশেষ বক্তৃতাবলির বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজনমত বিশেষ উপাধিদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার আয়োজন করার জন্য পরোক্ষ নির্দেশও উক্ত ডেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয় সেগুলোতে অধ্যাপনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সেগুলো সম্পূর্ণ অনুমোদন ধর্মীই ছিল এবং প্রকৃত অধ্যাপনার দায়িত্ব সরকারি কলেজগুলোর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার পর উডের নব প্রকল্পের তৃতীয় স্তরে ছিল ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা। এই শিক্ষা স্তরের উপরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। এ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজগুলোর মাধ্যমে প্রসারিত হবে। উচ্চ শিক্ষা স্তরের নিচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো। আর সকলে নিচের দিকে থাকবে প্রাথমিক বা দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করা হবে।

জনশিক্ষা পরিকল্পনা

ইতোপূর্বে সরকারের নিম্নগামী পরিস্রবন নীতির ফলে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশই কলেজ স্থাপনার জন্য ব্যয় করা হত। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ভীষণভাবে অবহেলিত হয়েছিল। প্রচুর সরকারি অর্থ ব্যয় করে এতদিন কলেজ শিক্ষার মাধ্যমে যে উচ্চশিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে তাতে সমাজের উচ্চস্তর থেকে আগত মুষ্টিমেয় ছাত্র উপকৃত হয়েছে। তাই ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক যাতে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়োরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ডেসপ্যাচে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বপক্ষেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়।

ডেসপ্যাচের জনশিক্ষা পরিকল্পনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- প্রথম : নিম্নগামী পরিস্রবন মতবাদের বর্জন
- দ্বিতীয় : মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ এবং
- তৃতীয় : ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান।

সরকারি অনুদান

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপরোক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সরকার এককভাবে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পক্ষপাতি ছিল না। তাই ডেসপ্যাচে নীতি গ্রহণ করা হয় যে ভারতীয় জনসাধারণের উপরই শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব অর্পণ করে সরকার নিজে কিছু অনুদান প্রদানপূর্বক আংশিক দায়িত্ব পালন করবে। এই নীতি গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী

হয়ে অধিক গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সহযোগিতা করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে ডেসপ্যাচ অনুদান প্রদানের নির্দেশ দেয়। তবে সরকারি অনুদান পাবার জন্য শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-

১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে। অবশ্য যদি কোথাও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা উপেক্ষা করা হবে।

২) স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।

৩) সরকারি পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার করবে ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলবে।

৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নিবে।

সরকারি অনুদান (গ্রান্ট-ইন-এইড) প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশি উপকৃত হয়েছিল। তবে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল। অনুদান মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :

- শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সেজন্য তার কিছু অংশ সাহায্যরূপে দান (Salary grant)।
- নির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট হারে সাহায্য দান (Fixed period grant)।
- পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দান (Payment by result)।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

সার্থক শিক্ষাদানে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের একান্ত অভাব সম্বন্ধেও ডেসপ্যাচ উল্লেখ করে। সেই উদ্দেশ্য শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করার জন্য ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কূল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এ সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান এবং চাকুরীতে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা

ডেসপ্যাচ সাধারণ মানুষের বৃত্তিসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে। আইন, চিকিৎসা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য পৃথক মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। এ সঙ্গে আরো বলা হয় যে এসব মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত হবে।

নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বারোপ

ভারতবর্ষের নারী শিক্ষা অনেক পিছিয়ে রয়েছে অথচ নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে জনশিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না- এই উপলব্ধি থেকে ডেসপ্যাচ ভারতে অধিকসংখ্যক নারী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয় এবং অনুদান প্রথার মাধ্যমে নারী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়।

উডের ডেসপ্যাচের লক্ষণীয় দিক হল- (১) ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার; (২) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদান কিভাবে চলবে এ সম্বন্ধে চিন্তাপ্রসূত সুপারিশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদবী কি ছিল?

২. জনশিক্ষা পরিচালকের অধীনস্থ কারা? তাঁদের দায়িত্ব কি?

৩. উডের ডেসপ্যাচ কোন কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিল?

৪. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো বর্ণনা করুন।

৫. সরকারি অনুদান পেতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কি কি শর্ত পূরণ করতে হত?

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ডেসপ্যাচের সুপারিশ কি কি?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উডের ডেসপ্যাচে উল্লেখিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ-১.৩ হান্টার কমিশন (১৮৮২) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হান্টার কমিশনের সুপারিশকৃত ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হান্টার কমিশন প্রস্তাবিত ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- ভারতের উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

উডে ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানের রীতি গ্রহণ এবং ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও পরিকল্পনাসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন নামে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনে ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ, ভূদেব মখোপাধ্যায়, আন্নদামোহন বোস, কাশীনাথ তেলাং, জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। কমিশন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অনুদান প্রথার উন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে দেশীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তারকল্পে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনাসহ অর্থ, অনুদান এবং পাঠক্রম বিষয়ক সুপারিশ প্রদানপূর্বক ভারতে তথা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রচনা করেছিল।

দেশীয় শিক্ষায় গুরুত্বারোপ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কমিশনের সুপারিশ

কমিশন দেশজ পদ্ধতিতে ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলগুলোর অনুমোদন এবং সম্প্রসারণ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ বা পাঠক্রম নির্ধারণ সম্পর্কে স্বাধীনতা প্রদান ও সহানুভূতিসূচক পরিদর্শন ব্যবস্থার আয়োজনের মাধ্যমে স্কুলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনার উপর জোর দেয়। এসব স্কুলের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও পরিদর্শনের সরাসরি দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটি এবং লোকাল বোর্ডের উপর অর্পণ করার সুপারিশ করা হয়। তবে সরকারি শিক্ষা বিভাগও এরূপ দেশজ বিদ্যালয়গুলোর বিদ্যালয় নির্বাচনে সহজ হবে। এভাবে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন দেশীয় বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু কমিশনের এই সুপারিশ কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেন। ফলে কালক্রমে দেশীয় বিদ্যালয়গুলো অবহেলায় অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা

হান্টার কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা হল জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই কমিশন প্রাথমকি শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রশাসনিক সুপারিশ প্রদান করে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একটি জিলা অথবা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড স্ব-স্ব এলাকার স্কুলগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এর জন্য স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ সকল সদস্য অথবা কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে স্কুল বোর্ড গঠন করতে পারে। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা নিজেদের তৈরি স্কুলবোর্ড স্ব-স্ব এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। এর জন্য কোথাও নতুন স্কুল স্থাপন এবং পুরাতন স্কুলগুলোর উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর দায়িত্বও ধীরে ধীরে এই স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর অর্পণ করলে নিশ্চয়ই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হবে-এই ছিল কমিশনের ধারণা। কিন্তু কার্যত ফল হল বিপরীত। কারণ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নিতান্ত দুর্বল। ফলে তারা এত বড় গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে নি।

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন।

- প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ অর্থভাণ্ডার সংরক্ষণ করবে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার ও অধিকতর পরিমাণে দাবী থাকবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সংকুলানের জন্য এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যয় ও নর্মাল স্কুল পরিচালনার ব্যয় প্রাদেশিক সরকার বহন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যসূচি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল যে, প্রয়োজনভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। পাঠক্রমে থাকবে গণিত, হিসাব-শিক্ষা, পরিমিতি বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞান। কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়ের কথাও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। কমিশন আঞ্চলিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠ্যসূচি নির্ণয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন হবে বলে সুপারিশ করা হয়। এর ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রয়োজনভিত্তিক নমনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের দিকেও কমিশন গুরুত্বারোপ করে এবং প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে একটি করে শিক্ষা প্রশিক্ষণ স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহদান

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কমিশনের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থানা প্রসঙ্গে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ক্রমশ সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ প্রত্যাহার করে আর্থিক অনুদানের সাহায্যে বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করে। উপরন্তু বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা সভা স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের বেতনের হার নির্ধারণ করতে পারবে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চমান সংরক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে উচ্চমানের সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় থাকবে। তাছাড়া অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য সরকার নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারবে।

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম

ইতোপূর্বে মাধ্যামিক বিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে শুধু একমুখী তত্ত্বগত বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। অথচ যুগের দাবী ছিল ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে। তাই কমশিন উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন, যথা-'এ' কোর্স এবং 'বি' কোর্স। 'এ' কোর্স-এ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পরীক্ষার পাঠ্যবিষয় এবং 'বি' কোর্স-এ থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত, কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্যবিষয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে সম্পর্কে কমিশন নীরব ছিলেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম করে শিক্ষা পরিচালনার পক্ষপাতি ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কমিশনের সুপারিশ

১. প্রতিটি কলেজের আর্থিক সাহায্য, শিক্ষক ও কর্মচারির সংখ্যা, পরিচালনার খরচ, দক্ষতা, স্থানীয় চাহিদা প্রভৃতি যাচাই করে দিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার

২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারকরতে হবে, তবে যে, সমস্ত কলেজের উৎকর্ষের উপর শিক্ষার মান নির্ভর করে, সে সমস্ত কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকতে পারে।

৩. সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির চাহিদা অনুযায়ী তাদের গৃহ নির্মাণ ও গৃহ মোরামতের জন্য অথবা আসবাবপত্র, গ্রন্থাগারের পুস্তক বা উপকরণ ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

৪. প্রতিটি কলেজে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য বিনাবেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মেধাবী শিক্ষার্থীগণ যাতে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারে তার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

ঐচ্ছিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন

৬. বড় বড় কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে ঐচ্ছিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে হবে যাতে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজনমত শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পেতে পারে।

৭. উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

বিদেশী ডিগ্রীধারীদের বিশেষ সুযোগ

৮. ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভারতীয়। ডিগ্রিধারীগণকে সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষাদানের বেলায় বিশেষ সুযোগ দিতে হবে।

৯. ধর্মীয় মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমন একখানি নৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যা সরকারি ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

১০. প্রত্যেক সেশনে কলেজের অধ্যাপকগণ নিজ ক্লাসগুলোতে নিয়মিতভাবে নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় হান্টার কমিনের সুপারিশ কি ছিল?
২. প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়ন সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন ।
৩. হান্টার কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কি সুপারিশ ছিল
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা উল্লেখ করুন ।
৫. কলেজের আর্থিক অনুদান কমিশন কিভাবে নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেছিল?
৬. কমিশন কোন প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ বর্ণনা করুন ।
২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ আলোচনা করুন ।

পাঠ-১.৪ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধারাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বৃটিশ সরকার ভারতে শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। সেই লক্ষ্যে উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪), স্টানলির ডেসপ্যাচ (১৮৫৯), হান্টার কমিশন (১৮৮২) প্রভৃতির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তারে তৎপর হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এরা শিক্ষাসহ ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানের চিন্তাভাবনা শুরু করলে ইংরেজ শাসনের কুফলগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে এ সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশকে দমন করার মানসে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৮-১৯০৫) প্রশাসনিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শিক্ষা সংস্কার এ কর্মসূচীর একটি অংশ। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের শিক্ষা সংস্কারের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশঃ

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা

কমিশন নিয়োগকালে বাঙ্গালোর, ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিবাক্রম, আলীগড়, নাগপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছিল। কমিশন নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে যে, বৃটিশ ভারতে এখনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী নয়।

শিক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্ক কমিশনের সিদ্ধান্ত

কমিশন বর্তমান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে (কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে) শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত করে। কারণ, চলতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনস্থ অনুমোদিত কলেজগুলো বিক্ষিপ্তভাবে দূর দূরান্তে অবস্থিত ছিল। কলেজীয় শিক্ষার কর্মসূচী সকল ক্ষেত্রে সমান ছিল না এবং শিক্ষাগত মানও উন্নত হয়নি। তাই কমিশন সুপারিশ করে যে-সর্বপ্রথমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন কলেজীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান ও মাননোন্নয়ন করা। তাছাড়া পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমন ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন যেন তারা উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগ করে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হপারে। স্নাতক স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে কলেজগুলোর উপর। আর স্নাতকোত্তর শিক্ষার দায়িত্ব পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে। এর জন্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকবে নিজস্ব অধ্যাপক, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস ও আনুষিক সুযোগ-সুবিধা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কমিশন সিনেটের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে সিনেটরদের সংখ্যা নির্দেশ করার উপর গুরত্ব প্রদান করে। কমিশন প্রস্তাব করে যে, সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তবে প্রতি বছর পাঁচভাগের একভাগ সদস্য যাতে অবসর গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক, কৃতবিদ্যা পণ্ডিত ব্যক্তি, সরকারি কর্মচারি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় সিনেট প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সিন্ডিকেটে থাকবেন নয় থেকে

পনের জন সভ্য। তাঁরা সিনেটর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন, সিন্ডিকেট যেন আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে এবং সেখানে যেন বিশ্ববিদ্যায়ের বিভিন্ন ফ্যাকালটির সদস্যরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

কলেজ পরিদর্শন ও অনুমোদন ব্যবস্থা

কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করেন যে, অনুমোদন দানের পূর্বে সকল তথ্যের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং অনুমোদিত কলেজের শিক্ষাদানের মানের যাতে অবনতি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একথাও সুস্পষ্টভাবে কমিশন বলে যে, প্রত্যেক কলেজে উপযুক্তভাবে সংগঠিত কার্যকর সমিতি, শিক্ষকমণ্ডলী, উপযুক্ত ছাত্রাবাস ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণের যথেষ্ট আয়োজন রাখতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন ও দাবী এবং ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনুমোদিত কলেজগুলোতে ন্যূনতম বেতনহার নির্দিষ্ট করার জন্যও কমিশন সিন্ডিকেটকে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দেন। নিম্নমানের কলেজগুলো যদি উৎকর্ষ সাধনে অক্ষম হয়, তাহলে সেগুলোকে উচ্চ স্কুলে পরিণত করাই বাঞ্ছনীয় বলে এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কল্যাণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, হোস্টেল খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা অনুসারে বেতনহার পরিবর্তন ইত্যাদি শিক্ষার্থী কল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ। অবশ্য উল্লেখিত বিষয়াবলি অনুমোদন দানের সময় বিবেচিত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।

পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি

পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট পুস্তক থাকবে না। স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষা অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কমিশন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও ডিগ্রি কোর্সের ক্ষেত্রে এরূপ ভাষা শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেনি। পরীক্ষা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার মানোন্নয়ন করে ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আরও কঠোর করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ধার্য ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম নির্ধানরণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মন্তব্য করেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯০৪

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯০২ খ্রী:) সুপারিশ এবং সরকারি শিক্ষা প্রস্তাবে (১৯০৪ খ্রি:) ঘোষিত নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে মার্চ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করে। উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধুমাত্র পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, যাদুঘর নির্মাণ, ছাত্রাবাস নির্মাণ করার নিমিত্তে আইন প্রণয়ন ও শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (১৯০৪) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ রাখা হয়েছিল তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হল :

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং গবেষণা, গ্রন্থাগার ও ছাত্রাবাস পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী বিস্তৃত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট

- সিনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জনের কম বা ১০০ জনের বেশি 'ফেলো' থাকবে না এবং কোন 'ফেলো' আজীবন সদস্য থাকতে পারবেন না। তাঁদের কার্যকাল হবে পাঁচ বৎসর। ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৮০

জনকেই সরকার মনোনীত করবেন ।

- পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০ জন এবং নতুন দু'টি (পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন করে নির্বাচিত 'ফেলো' নেওয়া চলবে । এইভাবে এ আইনের সাহায্যে নিনেটে নির্বাচিত ফেলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে ।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করে সিন্ডিকেটকে আইনানুগ অনুমোদন দেওয়া হবে ।

কলেজ পরিদর্শন ও অনুমোদন

- বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন লিপিবদ্ধ হবে এবং কলেজগুলো যাতে নিয়মিত পরিদর্শন হয় এবং অনুমোদনের পূর্বে সরকারি অনুমতি নেওয়া হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হবে ।
- সিনেটে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনকে কার্যে পরিবর্তন করতে না পারলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য, এমন কি নতুন নিয়মকানুন প্রণয়নের ব্যাপারেও সরকারি কর্তৃপক্ষকে আইনসঙ্গত ক্ষমতা অর্পণ করা হবে । ১৮৫৭ সালের আইনে সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাঞ্চল নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পিত হবে বড়লাটের উপর । ১৮৫৭ সালের আইনে এই বিধানটিও ছিল না, ফরে নতুন আইনটি জনগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করল ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগকালে ভারতের কোন কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছিল?

২. কমিশন কেন কলিকাতা বোম্বে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে বিরোধিতা করেছিল?

৩. কমিশনের প্রস্তাব মতে সিনেট সদস্যদের কার্যকাল কত বৎসর ছিল?

৫. নতুন কলেজ অনুমোদনের সময় কি কি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছিল?

৬. পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন ।

৭. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (১৯০৪) বিশ্ববিদ্যালয়কে কি কি দায়িত্ব অর্পণ করেছিল?

৮. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (১৯০৪) সিনেট গঠন সম্পর্কে সুপারিশ কি ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন ।

২. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯০৪) ধারাগুলি বর্ণনা করুন ।

পাঠ-১.৫ লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধারাগুলো আলোচনা করতে পারবেন;
- লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যেসব নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো জানতে পারবেন।

সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল তা হলো ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক প্রসঙ্গ। মূলতঃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে লর্ড কার্জন বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কার ও তাঁর শিক্ষানীতি (১৯০৪) বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ রচনা করেছিলেন। লর্ড কার্জন শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অধিক পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়ের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নকল্পে শিক্ষা অধিকর্তার (Director of Education) পদ সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ (ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরনের ইচ্ছুক বিদ্যালয়সমূহ) বিভাগসমূহ শিক্ষা বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া প্রবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেছিলেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা গত সংকোচন ও গুণগতমান উন্নয়ন

উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশক্রমে গ্রান্ট ইন এইড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। তার ফলে বহুক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছিল। এমন অনেক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল যেগুলোতে অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষাদান করা হত। তার ফলে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না। কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার এই অনিয়ন্ত্রিত কার্যকারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না। কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার এই অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার রোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নীতি দুটি কথায় প্রকাশ করা যায়, সংখ্যাগত সংকোচন ও গুণগত মানোন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার মানের উন্নয়ন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ধরনের নিম্নমানের স্কুল অবাধভাবে স্থাপিত হয়ে চলেছিল, সে ধরনের স্কুল আর প্রতিষ্ঠা না করে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মানের উন্নতি করাই ছিল কার্জনের মূলনীতি।

সরকারী বেসরকারী উভয় মাধ্যমিক স্কুলের নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনে শর্তারোপ

মাধ্যমিক শিক্ষার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন স্কুলগুলোতে অনুমোদন প্রথার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এর আগে কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত (Adided) স্কুলগুলোর উপরই শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল এবং ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগ এই নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। ১৯০৪ সালের সরকারের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সেই নীতি পরিত্যাগ করে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই নীতি অনুসারে স্কুল অনুমোদনের শর্তাদি রচনা করা হল। এই শর্তগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আইনের

কলেজ অনুমোদনের শর্তাদির মতই ছিল এবং ঘোষণা করা হল যে একমাত্র অনুমোদিত স্কুলগুলোই গ্রান্ট ইন এইডের জন্য আবেদন করতে পারবে।

শিক্ষা বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের প্রথার প্রবর্তন

যে সমস্ত স্কুল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের ইচ্ছুক হবে সেগুলোকে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন ছাড়াও যে বিশ্ববিদ্যালয় ঐ পরীক্ষা পরিচালিত করবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে হবে। ফলে স্কুলগুলোর উপর দু'প্রকারের অনুমোদন প্রথা বলবৎ হল। প্রথম, শিক্ষা বিভাগের; দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই দ্বিবিধ অনুমোদন প্রথার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বাধাহীন প্রসার বিশেষভাবে খর্ব হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিভাগের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কুল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যও আরও অসুবিধা হত। এই যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অসুবিধা কিছুটা দূর হয়।

অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা

শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত স্কুলগুলো নিম্নিলিখিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হল :

- সরকারি গ্রান্ট-ইন-এইড লাভ;
- সরকারি পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র প্রেরণ;
- সরকারি ছাত্র বৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

এই নতুন নীতি অনুসারে অধিকসংখ্যক স্কুল যাতে অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বেসরকারি স্কুলগুলোতে অধিকতর পরিমাণে গ্রান্ট-ইন-এইড বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনুমোদনের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে পরিদর্শকমন্ডলীও সংগঠিত করা হয়।

যে সকল স্কুল অনুমোদন লাভের জন্য উৎসাহী হবে না সেগুলোকেও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করার উদ্দেশ্য এই মর্মে ঘোষণা করা হয় যে, অননুমোদিত স্কুলের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য স্বীকার করা হবে না এবং ঐ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন অনুমোদিত স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। এইভাবে অনুমোদিত স্কুলগুলোর মর্যাদা বিশেষভাবে খর্ব করা হয়। অনুমোদন শর্ত যথাযথভাবে মানতে পারার ফলে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কতগুলো নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

আদর্শ মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা

- সরকারি উচ্চ স্কুলগুলোতে আদর্শ বা 'মডেল' স্কুল রূপে পরিচালনা করা হবে। কার্জন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যাচারের নীতির সমর্থন করতেন না। তাই সিদ্ধান্ত নেন, শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রত্যেক শাখালয় সরকারি প্রচেস্টা অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকার পরিচালিত আদর্শ মডেল উচ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- বেসরকারি স্কুলগুলো যাতে সরকারি মডেল স্কুলের মত উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারে, তার জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রান্ট ইন এইড বিতরণের আয়োজন করা হবে। লর্ড কার্জন স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিশেষ মূল্য আরোপ করেননি এবং তাঁর এই নীতির ফরে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়ার নীতি ক্রমশঃ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লুপ্ত হয়।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের উন্নতিকরণ

- মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিও কার্জন অধিকতর মনোযোগ দেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি নির্দেশ দেন যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোকে উন্নত করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে।

- লর্ড কার্জন মাধ্যমিক পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক বিষয় প্রবর্তনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি বৃত্তিমূলক পরীক্ষারও আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।

শিক্ষার মাধ্যম

- শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর শিক্ষামূলক প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে শিক্ষার্থীর ১৩ বৎসর বয়সের আগেই ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের নীতি ছিল বেশ স্বতন্ত্র। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং পরিমাণগত বৃদ্ধির সংকোচন করেছিলেন। আর সেজন্য অনুমোদন প্রথা ইত্যাদির সাহায্যে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল বেশ উদার। সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ও গুণগত মানের উন্নয়ন, উভয়ই ছিল লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা লক্ষ করে লর্ড কার্জন যে সব মন্তব্য করেছিলেন সেগুলো হল:

- অতীতে সর্বদা প্রাথমিক শিক্ষার উপর গরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল;
- প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ আশানুরূপ হয়নি, তাই এখন থেকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে চেষ্টা করা প্রয়োজন;
- এর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি বরাদ্দ করা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে লর্ড কার্জন প্রস্তাবে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলো হল-

প্রথমত, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। শিক্ষাখাতে সংগৃহীত আঞ্চলিক তহবিলের অর্থ প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাবে না। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত বাজেটে শিক্ষা অধিকর্তার (Director of Education) অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রথা ত্যাগ করতে হবে।

তৃতীয়ত : পরিবেশগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে শহরাঞ্চল ও গ্রাম্যঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করতে হবে। মাতৃভাষা হবে এই শিক্ষার মাধ্যম।

চতুর্থত : প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা ও বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনীকিকরণ এবং নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে এই শিক্ষা গণশিক্ষার পথকে সুগম করে।

সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় প্রকার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে লর্ড কার্জনের মূলনীতি কি ছিল?
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কোন কোন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন নিতে হত?
৩. শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি কি কি সুযোগ পেত?
৪. অনুমোদন লাভে অনুৎসাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?
৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য লর্ড কার্জন কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন?
৬. সমকালীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লর্ড কার্জন কি মন্তব্য করেছিলেন?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধারাগুলি বর্ণনা করুন ।
২. লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি আলোচনা করুন ।

পাঠ-১.৬ স্যাডলার কমিশন (১৯১৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- স্যাডলার কমিশনে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- স্যাডলার কমিশনে ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাবসহ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গবঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে একদিকে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, অন্যদিকে লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির বিরোধীতা, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার দাবী, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের (১৯১০) পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের দাবী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির ফলে উপনেবিশক ভারত সরকার প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর পর্যালোচনা ও পূনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯১৩ সালে সরকার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা সংস্কার ও প্রসার সম্পর্কিত সুপারিশে বলা হয় যে প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষাদানের কাজে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধসহ নানা কারণে কোন প্রস্তাবই কার্যকর হয়নি। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য ১৯১৭ সালে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলার এর নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন সেকেন্ডারী ও ইন্টামিডিয়েট বোর্ড স্থাপনসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থা

স্যাডলার কমিশনের মতে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে না পারার প্রধান কারণ প্রথমটির আওতা থেকে উচ্চ শিক্ষা এবং দ্বিতীয়টির আওতা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাইরে রাখা হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন সম্ভব নয় বলে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো একযোগে পর্যালোচনা করে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমিশন ইন্টামিডিয়েট স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় হতে সরিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে সুপারিশ করেন যে,

ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথককরণ

- ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলো পৃথক করে পৃথক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে ইন্টারমিডিয়েট স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হতে হবে; অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া চলবে না। কলেজে প্রবেশের মাপকাঠি হবে ইন্টামিডিয়েট অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ে দু'বছর পড়ার পর।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে চিকিৎসা কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ।

- ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকবে না। নবগঠিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর উপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। এই ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলো ছাত্রদের ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশ লাভের জন্য কেবল কলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত করে তুলবে না, এতে চিকিৎসা, কারিগরি, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষারও আয়োজন থাকবে। এই ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে, অথবা, কোন কোন উপযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হঁতে পারবে।
- মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি রাজ্যে একটি মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠিত হবে। এতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিরা থাকবেন। বিদ্যালয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এই বোর্ড স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তাই বোর্ডে বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তার ব্যবস্থাও থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো বিচার করতে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, অনুমোদিত কলেজগুলোর শিক্ষাদানের সমস্যা, কলেজ শিক্ষকদের বেতন স্বল্পতা, চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব এবং উচ্চমানের পেশাগত মর্যাদা, উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তির শিক্ষাগত পেশায় অনাগ্রহ, বাস্তবধর্মী পঠন-পাঠনের অভাব, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অপরিবর্তনীয় আইন কানুন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নানাবিধ ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন-

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

- উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সংগঠিত করতে হবে।
- মফস্বলের কলেজগুলোকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করে কলেজগুলোর উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন

- লন্ডনে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ডিগ্রি কোর্স দু'বছরের স্থলে তিন বছরের করা হবে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অনার্স কোর্স চালু করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকদের অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক কোর্ট গঠন

- প্রশাসনিক কড়াকাড়ি হ্রাস করার জন্য সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে যথাক্রমে একটি ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক কোর্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কার্যকরী পরিষদ গঠন করতে হবে।
- অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠক্রম নির্ধারণ ডিগ্রি বিতরণ প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী একাডেমিক কাউন্সিল গঠন ও বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফ্যাকালটি ও বোর্ড অব স্টাডিজ গঠনের নির্দেশ দেওয়া যায়।
- প্রতিটি বিষয় পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে স্নাতকোত্তর স্তরে বিষয়ভিত্তিক বিভাগ স্থাপন এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে।

ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ

- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট মাসিক বেতনে একজন পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ভাইস-চ্যান্সেলরের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মান বজায় রাখতে বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণা করার সুযোগ দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের হাতে গবেষণার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে ।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন

- ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করে ।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ও পদোন্নতির বিষয় পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সংস্থার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় চাকুরী কমিশন গঠন করা প্রয়োজন ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন

- প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করতেহবে এবং বিএ (পাশ) ও ইন্টামিডিয়েট পাঠক্রমে 'শিক্ষাতত্ত্ব' নামে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হবে ।
- ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত থাকবে । ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে ডিপ্লোমা ও এইসব বিষয়ে পদ্ধতিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষায় সংগঠিত করতে হবে । প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত একজন প্রফেসরের সমান বেতনে একজন শারীরিক শিক্ষা পরিচালক নিয়োগ করতে হবে ।
- প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী বোর্ডসমূহের অন্যতম বোর্ড হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিনিধিসহ ছাত্র কল্যাণ বোর্ড থাকবে ।

প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব প্রদান

- ভারতে শিল্প উন্নতি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করতেহবে ।
- নারী শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হয় । এসঙ্গে ১৫/১৬ বৎসর বয়সের মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুল স্থাপনেরও সুপারিশ করা হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্যাডলার কমিশন কার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল?
২. কমিশন কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন স্তরের পরীক্ষা পাশকে যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করেছিল?
৩. মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন কোন কর্তৃপক্ষ গঠনের সুপারিশ করেছিল?
৪. কমিশন ডিগ্রি কোর্স কত বৎসরের হবে বলে সুপারিশ করেছিল?
৫. কমিশন সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে কোন বোর্ড গঠনের কথা বলেছিল?
৬. একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্ব কি ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ রেখেছিলেন তা আলোচনা করুন ।
২. উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন ।

পাঠ-১.৭ হার্টগ কমিটি রিপোর্ট (১৯২৯) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সুপারিশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ▶ নারী শিক্ষা ব্যবস্থাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে হার্টগ কমিটির প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- ▶ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাবসহ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং হার্টগ কমিটির রিপোর্টের প্রশাসনিক সুপারিশসমূহ জানতে পারবেন ।

ঔপনিবেশিক ভারত সরকারের ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (মন্টেন্ড-চেমসফোর্ড সংস্কার) আইন অনুযায়ী হয়েছিল যে, সংস্কার কার্য কতটুকু কার্যকরী হল তদন্তের জন্য একটি রয়েল কমিটি দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯২৯ সালে নিযুক্ত হবে । কিন্তু সমগ্র দেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ের দুই বৎসর আগেই অর্থাৎ ১৯২৭ সালে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করা হয় । এই সময়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনমনে অসন্তোষ দেখা দেয় । তাই সাইমন ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য ১৯২৮ সালে স্যার ফিলিপ হার্টগ এর সভাপতিত্বে এক উপ কমিটি গঠন করেন । কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের উদাসীনতা, গণশিক্ষার অবনতি, প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণ অকৃতকার্যতা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণ প্রমোশন, উচ্চ শিক্ষায় অযোগ্য শিক্ষার্থীর ভীড় ইত্যাদি চিহ্নিত করে শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি, পরিদর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাস্তবধর্মী পাঠ্যক্রম প্রবর্তন প্রভৃতির উপর জোর দিয়ে ভারতে শিক্ষার উন্নয়নকল্পে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এক সুপারিশ পেশ করেন । যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠনে সহায়ক হয় ।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা তথা প্রাথমিক অগ্রগতির লক্ষে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রদান করেন-

- প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য স্কুলগুলোর পুনর্বণ্টন করতে হবে । অপ্রয়োজনীয় স্কুলগুলো তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

- শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঞ্জীবনী কোর্সের (Refresher Course) ব্যবস্থা করতে হবে । বেতনবৃদ্ধি ও চাকুরির অবস্থার উন্নতি করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশা গ্রহনে আকৃষ্ট করতে হবে ।
- প্রাথমিক শিক্ষার কাল কমপক্ষে চার বছর ধার্য করতে হবে । স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্কুল বসবার সময় নির্ধারণ ও ছুটির দিনগুলো ধার্য করতে হবে । নিচের ক্লাসগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সেখানে বন্ধতা (Stagnation) ও অপচয়ের ফলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস না পায় ।

ধীরে ধীর প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা

- স্কুল-পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করেই পল্লী উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে । উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হবার আগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা চলবে না । ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এক একটি অঞ্চল ধরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে ।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ ছিল-

বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন

- নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের (Middle Vernacular School) পাঠ্যসূচিকে বহুমুখী করতে হবে যেন এরূপ বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র স্ব-স্ব প্রবণতা অনুসারে পড়াশুনা করতে পারে ।
- নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পর অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য আকৃষ্ট করতে হবে ।
- হাই স্কুল স্তরে বিকল্প পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে পাঠ গ্রহণ করতে পারে ।
- নিচের শ্রেণীগুলোতে ক্লাস প্রমোশনে কড়াকড়ি করতে হবে ।

উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিটি যে সমস্ত প্রস্তাব করেছিল তা হলো-

- উচ্চ শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে যাতে অযোগ্য শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হতে না পারে ।

অনার্স কোর্স চালু

- কতকগুলো নির্বাচিত কলেজে অনার্স কোর্স চালু করতে হবে ।
- কলেজ লাইব্রেরির উন্নয়ন, টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে ।

নারী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

কমিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের তারতম্য লক্ষ করে নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করে-

- মেয়েদের জন্য অনুকুল পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে ।

শিক্ষিকা ও পরিদর্শিকা নিয়োগ

- যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিকা ও পরিদর্শিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- নারী শিক্ষাকে আবশ্যিক করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।
- প্রতি প্রদেশে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ করতে হবে ।

প্রশাসন

কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে যে, শিক্ষা বিষয়টিকে কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অসময়ে ও খুব তাড়াহুড়া করে হস্তান্তর করা হয়েছে। শিক্ষার ন্যায় একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা উচিত ছিল । কমিটি আরো বলে স্থানীয় বোর্ডগুলোর হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পন করা মোটেই উচিত হয়নি । শিক্ষায় প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য কমিটির সুপারিশ ছিল:

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ

- দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করতে হবে ।
- প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় বোর্ডের উপর দেওয়া চলবে না ।
- শিক্ষা বিভাগ ও পরিদর্শন বিভাগের কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে ।
- কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব থেকে এডুকেশনাল কমিশনারকে মুক্তি দিতে হবে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব

- শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রাদেশিক সেক্রেটারী এবং জনশিক্ষা অধিকারীকদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে কার সভাপতিত্বে হার্টগ কমিটি গঠিত হয়?
২. প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ কি ছিল?
৩. কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা কাল কত বৎসর ধার্য করেছিল?
৪. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৫. উচ্চ শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য কমিটির সুপারিশ কি ছিল?
৬. নারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ কি ছিল?
৭. কমিটির সুপারিশ মতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কি ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে হার্টগ কমিটির সুপারিশসমূহ বর্ণনা করুন।
২. উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হার্টগ কমিটির প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন।

পাঠ-১.৮ উড-এবট রিপোর্ট (১৯৩৭) : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- উড-এবট রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো জানতে পারবেন এবং;
- উড-এবট রিপোর্টে প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন;

হার্টগ কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বব্যিাপী অর্থসংকট সর্বোপরি ভারতে নতুন করে জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার ফলে কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ শিক্ষার মান উন্নয়নের অজুহাতে শিক্ষা সংগঠনের নামে শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। জনসাধারণ সরকারি শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। বস্তুত শিক্ষা বিভাগের আইইএস (IES) কর্মকর্তাগণ শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশ্নেই শিক্ষা সংকোচনে যত পরিমাণ উৎসাহী ছিল, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হার্টগ কমিটির অতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ বাস্তবায়নে ততটা উৎসাহী ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা (CABE) শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব এডুকেশনের কারিগরি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক মি: এ এবট এবং ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স মি: এস এইচ উড এর নেতৃত্বে বিশেষত বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এঁরা বৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন।

সাধারণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করেছিল:

শিশুর মানসিক বিকাশের শিক্ষা

- বিদ্যালয়ের শিশু-শ্রেণীর শিক্ষার ভার যতদূর সম্ভব বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এ জন্য স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতার উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষার জন্য বইয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিশুদের উপযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত সংকীর্ণ পাঠক্রমভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মানসিক গঠনের অন্তরায়। গ্রাম্য মধ্যশিক্ষার পাঠ্যক্রম গ্রাম্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হবে। ইংরেজি এই স্তরে শেখানো হলেও দেখতে হবে ভাষার ভারে যেন শিক্ষার্থী পিষ্ট না হয়।

শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি

- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজি বাধ্যতামূলক হবে। সাধারণ ছাত্রদের যতদূর সম্ভব ব্যবহারিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে। উপযুক্ত ও আগ্রহশীল ছাত্রদের ইংরেজি সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি সাহিত্যের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ দু'টি স্তরে বিভক্ত থাকবে। শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে নর্মাল স্কুল বা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার অর্জনের পর স্বল্পকাল ট্রেনিং নিতে হবে; এজন্য রিফ্রেসার ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সাথে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষে দেশে শিল্প কারখানার প্রসার, বৃত্তিশিক্ষায় উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি, বৃত্তি শিক্ষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সর্বোপরি এ শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার মত কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক গঠনের উপর জোর দিয়ে কমিটি বৃত্তি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেছিলেন তা নিম্নরূপ:

- বৃত্তি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা নিম্নস্তরের শিক্ষা নয়। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহ ও মনের শক্তিকে উদ্বোধিত করা, যার ফলে শিক্ষার্থী সমাজের কল্যাণ সাধনকর হতে পারে।
- সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নয়, কারণ বৃত্তি-শিক্ষার ভিত্তি সাধারণ শিক্ষায় নিহিত।

বৃত্তি-শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয়

- সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে না, কারণ এতে ভিন্ন রকমের কাজ করতে হবে।
- বৃত্তি-শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু বৃত্তি লাভের জন্যই এ শিক্ষার প্রয়োজন, তাই শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সহযোগিতায় এ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের সহযোগিতার জন্য শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ও দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে বৃত্তি-শিক্ষার জন্য উপদেষ্টা সমিতি গঠন করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তর

- বৃত্তিশিক্ষার স্কুলগুলো জুনিয়র ও সিনিয়র এই দুইভাগে বিভক্ত থাকবে।
- নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে জুনিয়র বৃত্তিশিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থী সিনিয়র বৃত্তিশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করবে।

বৃত্তি-শিক্ষা কাল

- জুনিয়র বৃত্তিশিক্ষা তিন বছরকাল স্থায়ী হবে এবং সিনিয়র বৃত্তিশিক্ষার কাল দু'বছর স্থায়ী হবে। এই শিক্ষাকে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের সমান বলে গণ্য করা হবে।
- কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য খন্ডকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় বৃত্তি শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৃত্তি নির্বাচনে পরামর্শদান

- শিক্ষার্থী অল্প বয়সে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বৃত্তি নির্বাচনে যাতে ভুল না করে, সেজন্য তাকে পরামর্শ দেবার জন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতেও Vocational Guidance-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশগুলো ভারতের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই করা হয়েছিল। মি: এবট বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে সব মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই কাজে পরিণত করা হয়নি। বৃত্তিশিক্ষার সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে দিল্লী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দিল্লী "পলিটেকনিক" স্কুলে পরিণত করা হয়। এটিই বৃত্তিশিক্ষামূলক জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ বিদ্যালয়ে ৪টি বিভাগ ছিল-(১) পলিটেকনিক হাই স্কুল। এখানে ১০/১১ বছর থেকে ১৬/১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (২) ১৭ বছর থেকে অধিক বয়স্কদের জন্য সিনিয়র বৃত্তি শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। (৩) পল্লী শিল্প বিভাগ যেখানে পল্লীর বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৪) বয়স্কদের বহুমুখী শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে আরও কয়েকটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উড-এবট শিশু শিক্ষার ভার কার উপর ন্যস্ত করেছিল?
২. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে উড-এবট রিপোর্টে কি বলা হয়েছিল?
৩. বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
৪. বৃত্তি শিক্ষার স্কুল কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
৫. উড-এবট রিপোর্টে বৃত্তি শিক্ষাকাল সম্পর্কে কি সুপারিশ ছিল?
৬. বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কোনটি?
৭. বৃত্তিমূলক জাতীয় বিদ্যালয়ে কয়টি বিভাগ ছিল ও কি কি?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উড-এবট রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশগুলো আলোচনা করুন।
২. উড এবট রিপোর্ট বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বর্ণনা করুন।
৩. উড-এবট রিপোর্টে প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন।

পাঠ-১.৯ বুনিয়াদী শিক্ষা : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং;
- ▶ বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাপনার 'নয়া তালিম' পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করতে পারবেন।

ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিবর্তনের ইতিহাসে বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে যেসব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে শিল্পকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করাই হল বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার মানসে ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় মহাত্ম্যা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনাটি রচিত হয়। সেজন্য এটি ওয়ার্ধায় পরিকল্পনা নামে পরিচিত। পরে গান্ধী এই পরিকল্পনাটির নাম দেন বুনিয়াদী শিক্ষা। এই সম্মেলনে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার খসড়া পরিকল্পনার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন যে-

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা

- শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। একটি মূল শিল্পকে শিক্ষাদানের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনার অর্থ এই নয় যে সাধারণধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে একটি শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের শেখানোই হল এই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। একটি উদাহরণের দ্বারা ব্যাপারটি পরিস্কার করা যেতে পারে। সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো আবর্তন করে এবং সেই সূর্য থেকেই তাদের শক্তি ও তেজ তারা আহরণ করে তেমনই এই কেন্দ্রীয় মূল শিল্পটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আবর্তিত হবে এবং সেই শিল্পটির সাহায্যেই সেই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা শিক্ষা করবে।
- শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্বনির্ভর। ছাত্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলা হবে।

দৈহিক শ্রমের মূল্য

- দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে-যাতে শিক্ষা শেষে ছাত্ররা নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে।
- শিশুর শিক্ষার সঙ্গে তার গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

শিক্ষার মাধ্যম

- শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম

- মূল শিল্প সুতাকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প।
- মাতৃভাষা।
- গণিত।
- সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গ্রাম্য অর্থনীতি ইত্যাদি।

- সাধারণ বিজ্ঞান-প্রকৃতিপাঠ, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য ।
- সঙ্গীত ।
- চারুশিল্প ।
- হিন্দুস্থানী ভাষা ।

বুনিয়াদী শিক্ষা কার্যকরণ

বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীকে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয় । রিপোর্টে বহিঃপরীক্ষা বর্জনের সুপারিশ করা হয় । পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সহ-শিক্ষা ব্যবস্থাকে কমিটি সমর্থন করেন ।

বুনিয়াদী শিক্ষা কার্যকরণ

রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিহার, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রধান প্রধান কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়ে যায় । অচিরেই বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় । বিশেষ আধিকারিদের অধীনে বিহার, বোম্বাই ও উড়িষ্যায় বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয় ।

বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর বিভাগ

১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষার্থীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কিছু সংস্কার সাধন করা হয় । বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য । তার কম বয়সী বা বেশি বয়সী ছেলেমেয়েদে শিক্ষার সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি । গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্য "নয়া তালিম" পরিকল্পনা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা হবে "মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা" । নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র । এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ।

নয়া তালিম পরিকল্পনা

১. প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষা : ৭ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ।
২. বুনিয়াদী শিক্ষা : ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা
৩. বুনিয়াদী উত্তর শিক্ষা : ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের শিক্ষা ।
৪. প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা :

প্রতি স্তরেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রাক-বুনিয়াদী স্তরে খেলাকে কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ, শিশুর কাছে খেলা আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । হিন্দুস্থায়ী তালিম সঙ্ঘ বিভিন্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন । সেবাগ্রাম সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমশরুওয়ালা মন্তব্য করেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজ বিপ্লব সাধিত হবে ।

১৯৪৬ সালে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হবার নতুন উদ্দীপনার সঙ্গে বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয় । দেশীয় রাজ্যে, বিশেষ করে কাশ্মীরে, বুনিয়াদী শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে । অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা হয় । যুদ্ধোত্তর শিক্ষার জন্য সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাদের শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে । প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকালে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?
২. শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে কি বুঝেন?
৩. বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা?
৪. বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করুন ।
৫. বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের কোন কোন প্রদেশে কার্যকরী করা হয়েছিল?
৬. নয়া তালিম অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষার কয়টি স্তর ও কি কি?
৭. বুনিয়াদী শিক্ষা কোন দেশীয় রাজ্যে প্রসার লাভ করেছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যাহা জানেন লিখেন ।
২. নয়া তালিম পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখপূর্বক বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন ।

পাঠ-১.১০ সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমুহ জানতে পারবেন;
- সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং ।
- সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো আলোচনা করতে পারবেন ।

ভারতে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবাসী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । ফলে ঔপনিবেশিক সরকার দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডেসপ্যাচ, কমিশন ও রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা নেয় । কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের অজহাতে সরকার শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করে এবং এডুকেশন ব্যুরো তুলে দিয়ে (১৯২৩) শিক্ষার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে । এ সঙ্গে বিভিন্ন ডেসপ্যাচ, কমিশন, রিপোর্টের প্রস্তাব কার্যকর করতে সরকার আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেনি, এরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) পরবর্তী ভারতের শিক্ষা উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন । কমিটি ১৯৪৪ সালে অন্তত ৪০ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমপর্যায়ভুক্ত করার লক্ষে এক ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে । নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্ক শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কোনটাই এ শিক্ষা পরিকল্পনায় বাদ যায়নি । শিশু শিক্ষা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, অবসর-বিনোদন, শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ প্রদান করেছিলেন যা পরবর্তীকালে ভারতে ও বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে প্রভূত সহায়ক হয় ।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

শিশু শিক্ষা ও নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন

যুদ্ধ পরবর্তী শিক্ষা উন্নয়নে প্রাক প্রাথমিক স্তরের জন্য কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো এবং খের কমিটির সুপারিশগুলো বিবেচনা করেন ও বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শকে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করেন ।

প্রথমত : প্রস্তাব করা হয যে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের জন্য পৃথক নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন, আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে । এই অবস্থায় অন্ত দশ লক্ষ শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে যাবে । এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলেও সর্বদা অবৈতনিক রূপে পরিচালনা করা হবে । এখানকার শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা দেবেন শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাভাবিক উপায়ে সামাজিক আচরণবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ।

দ্বিতীয়ত : সার্জেন্ট কমিটি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার সুপারিশ করেন । এই শিক্ষাস্তর দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত হবে: (১) ছয় থেকে এগার (৬-১১) বছর বয়স্কদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদী (Junior Basic) এবং (২) এগার থেকে চৌদ্দ (১১-১৪) বছর বংস্ক শিক্ষার্থীদের জন্য হবে উচ্চ বুনিয়াদী (Senior Basic) স্তর ।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

তৃতীয়ত : সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে গ্রহণ করেছেন। যেমন, বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গৃহীত হলেও জন সার্জেন্ট আর্থিক স্বনির্ভরতার যুক্তিটি অনুমোদনব করেননি। তাঁর মতে "যে কোন স্তরের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য তাঁর সামগ্রীর দ্বারা আপন ব্যয়ভার মিটিয়ে নেবে, এ ব্যবস্থা কোন মতে সমর্থনযোগ্য নয়"।

সর্বশেষে বলা যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে, বাস্তব ও কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে, শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার উপর কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

সার্জেন্ট কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন:

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল ও ভর্তির যোগ্যতা

- উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ছয় বৎসরব্যাপী হবে এবং ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে উচ্চ বিদ্যালয় ভর্তি করা হবে। ছাত্রদের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাধারণ বয়স এগার বৎসর হওয়া চাই। যে সমস্ত ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সকল সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারবে একমাত্র তাদেরই উচ্চ বিদ্যালয়ের ভর্তি করা উচিত। রিপোর্টে ছাত্রদের নির্বাচন করার জন্য কতকগুলো সাধারণ নিয়মও উল্লিখিত হয়।
- মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা হবে।

একাডেমিক ও টেকনিক্যাল বিদ্যালয়

- উচ্চ বিদ্যালয়গুলো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হবে-একাডেমিক এবং টেকনিক্যাল। একাডেমিক বিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেবে, আর টেকনিক্যাল বিদ্যালয় প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করবে।
- উভয় ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য সার্জেন্ট রিপোর্টে পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম

- উচ্চ বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে সার্জেন্ট রিপোর্টে বলা হয় : যে সমস্ত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা বেশী তাদের চাহিদা মেটানো হল উচ্চ বিদ্যালয়ের কাজ। উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ (Complete in itself)। এ শিক্ষার পর যাতে অধিকাংশ ছাত্ররা সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পাঠ্যক্রম

- পাঠ্যক্রমে বৈচিত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা, ইংরেজি, অন্য একটি আধুনিক ভাষা, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি চারুশিল্প, সঙ্গীত, দেহচর্চা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন লাগবে। তবে উপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য শতকরা ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রাখতে হবে।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো ছিল :

কলেজ ভর্তিতে কড়াকড়ি

- উচ্চ শিক্ষার মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য কলেজে ভর্তির সময় ছাত্র নির্বাচনে কড়াকড়ি থাকা উচিত। তবে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা যাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্যে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।
- ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলকেই দিতে হবে। ইন্টামিডিয়েট স্তরের এক বছর যোগ হবে স্কুলের সঙ্গে এবং অন্য একটি বছর যোগ হবে কলেজ স্তরের সঙ্গে। ফলে কলেজে থাকবে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স।

গবেষণামূলক শিক্ষা

- স্নাতকোত্তর স্তরে থাকবে গবেষণামূলক উচ্চমানের শিক্ষা।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ট ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। অধ্যাপকদের চাকুরীর শর্ত হবে উদার ও মর্যাদাসম্পন্ন।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও কর্মধারাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্যে ব্রিটেনের University Grants Comittee-এর মতো একটি নিখিল ভারত সংস্থা গঠন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ কি ছিল?
২. বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর কয়টি ও কি কি?
৩. কোন ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে বলে কমিটি মন্তব্য করেছিলেন
৪. সার্জেন্ট কমিটির মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ও ভর্তির যোগ্যতা বর্ণনা করুন
৫. সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয়গুলি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল?
৬. সার্জেন্ট কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন
৭. কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ কি ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশগুলি বর্ণনা করুন।
২. সার্জেন্ট রিপোর্টে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

পাঠ-১.১১ সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ জানতে পারবেন;
- ▶ বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ▶ সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে সহ-পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের বেতনসহ শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

সর্জেন্ট কমিটি বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে চার স্তরের বিদ্যালয়ের প্রস্তাব রেখেছিলেন :

১. ট্রেডস স্কুল অষ্টম শ্রেণীর পর এখানে দুই বৎসরে যে কোন একটি ট্রেড শিখান হবে।
২. কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এখানে ছয় বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে।
৩. উচ্চতর কারিগরি বিদ্যালয়-শিল্প সংস্থার কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের এবং পাঠ গ্রহণের কাল নির্ণয় হবে। এখানে ফোরম্যান, চার্জম্যান এবং অন্যান্য অফিসারগণ পড়াশুনা করে ডিপ্লোমা লাভ করবে।
৪. উচ্চতম কারিগরি শিক্ষা এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পর্যায়ে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার উপযুক্ত গবেষণার কাজ পরিচালিত হবে।

বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

কমিটি বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুপারিশ করে যে এ শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। পঁচিশ বা তার কম সংখ্যক বয়স্কদের নিয়ে একটা শ্রেণী গঠিত হবে। বয়স্কদের কাছে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্যে গ্রামোফন, রেডিও, চিত্র প্রদর্শনী, নৃত্যগীত প্রভৃতি পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। দশ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক মানুষ এখানে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

কমিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশসহ শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিটি প্রস্তাব করেন-

- বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে এক বছরের কোর্স চালু থাকবে এবং স্নাতক শিক্ষকরাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

তিন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল

- স্নাতক নন এমন শিক্ষকদের জন্য তিন ধরনের প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে যথাক্রমে (ক) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, (খ) বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং (গ) হাই স্কুলের স্নাতক নন এমন শিক্ষকরাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
- উপরন্তু প্রশিক্ষণকালে শিক্ষকদের খরচা বাবদ সরকারকেই অর্থ সাহায্য করতে হবে। এইসঙ্গে রিফ্রেসার কোর্স চালু করতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা

সার্জেন্ট রিপোর্ট প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষা-পরিবেশনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়:

- কালা ও বোবাদের জন্য এবং শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এগুলোকে সরকারি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষার সাথে সাথে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও সরকারি দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষান্তে যাতে প্রতিবন্ধীরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং উপার্জনক্ষম হতে পারে তার জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা লাভের পর যাতে শিক্ষার্থীরা চাকুরী বা কর্ম লাভের সুযোগ পায় তার জন্য কমিটি এমপ্লয়মেন্ট বুরো স্থাপনের সুপারিশ করেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

কমিটি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুপারিশ করে যে,

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- শিক্ষার শুরুতেই শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- নিম্ন বুনিয়াদী ও হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের কোর্স শেষ করার সময় তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- এসব মেডিক্যাল রিপোর্টে শিক্ষার্থীদের ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card)-এর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে এবং ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- সরকারি তরফ থেকে স্বাস্থ্যবিধি পালন, শিক্ষা ও রোগমুক্তির জন্য স্কুল ক্লিনিক খুলতে হবে।

সহ-পাঠ্যক্রমিক ব্যবস্থাপনা

কমিটি সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করেন:

- অবসর বিনোদমূলক আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক কাজের ব্যাপক আয়োজন করা হবে।

যুব আন্দোলন

- দেশে সমস্ত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যুব-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তরুণ তরুণীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্বে গ্রহণে শিক্ষা দিতে হবে।
- খেলাধুলা, আন্ত:বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা, দলবদ্ধ ভ্রমণ, নাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সহশিক্ষাক্রমিক কাজগুলো যুব আন্দোলনের অঙ্গীভূত হবে।

শিক্ষক বেতন ব্যবস্থা

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

সমগ্র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। বর্তমানে যে বেতন দেওয়া হয় এই বেতনে উপযুক্ত লোক শিক্ষকতাকে জীবনের উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হবেন না। শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতে হলে শিক্ষকদের আরও বেশি বেতন দিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষদের শোচনীয় অবস্থা অবিলম্বে পরিবর্তন করা আবশ্যক। প্রাথমিক বিধ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা হওয়া প্রয়োজন, এর কমে কোন উপযুক্ত লোক এ কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না।

শিক্ষা প্রশাসন

কমিটির শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশগুলো ছিল :

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ

- কেন্দ্রে থাকবে শক্তিশালী শিক্ষা বিভাগ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থার শক্তি অনেক বেশি সম্প্রসারিত করতে হবে। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষা সংগঠিত হবে।

প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম

- বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা স্তরের এককগুলো (Units) প্রাদেশিক সরকারের জনশিক্ষা অধিকারিকের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রয়োজন হলে প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারেন।
- জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ যোগসূত্র।

স্কুল কমিটি ও পরিদর্শকের কার্যক্রম

- জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারে মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগসূত্র।
- শিক্ষার প্রতি জনগণকে আকর্ষণীয় করার জন্য স্কুল কমিটি, স্কুলবোর্ড ও স্কুল পরিদর্শকরা সাধারণ জনগণসহ সরকারের সাথে সহযোগিতা করবেন।
- শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে All India Education Service-এর কৃতী ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৃত্তিমূলক শিক্ষা কয়টি স্তরে বিভক্ত থাকবে বলে সার্জেন্ট কমিটি প্রস্তাব করেছিল।
২. বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ কী ছিল?
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ কী ছিল?
৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবসমূহ বর্ণনা করুন।
৫. শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ কী ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিশেষ দিক উল্লেখপূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব প্রস্তাব সার্জেন্ট কমিটি রেখেছিল তা বর্ণনা করুন।

ইউনিট ২

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
[Educational Administration & Mangement in East Pakistan]

ভূমিকা

ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানে ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়ে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয় পূর্ববঙ্গ প্রদেশ (১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ হয়)। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পর বিশেষত পূর্ব বাংলায় একটি নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নানারকম সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবী উঠে। ফলে ১৯৪৭ সালে ২৭ নভেম্বর থেকে পাঁচদিন ব্যাপী করাচীতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Pakistan Advisory Board of Education) গঠনসহ পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দূ পড়া, স্কুল কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সামরিক প্রশিক্ষণ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন, কারিগরি শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, ১৯৫২ সালের পাকিস্তান শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (৬ষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা), ১৯৫৫-১৯৬০, ১৯৬০-১৯৬৫, ১৯৬৫-১৯৭০ প্রভৃতি পাঁচশালা পকিল্পনায় শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয়াবলি এবং ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি যা আকরাম খাঁন কমিটি রিপোর্ট নামে পরিচিত, শিক্ষা পূনর্গঠন কমিশন-১৯৫৭ যা আতাউর রহমান খাঁন শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত ইত্যাদির কাগুজে সিদ্ধান্তের আলোকে (বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।) বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তান ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলায় যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা চালু ছিল তা নিম্নবর্ণিত পাঠসমূহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

পাঠ-২.১ ঃ পূর্বপাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
পাঠ-২.২ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
পাঠ-২.৩ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন

পাঠ-২.১ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ঔপনিবেশিক পাকিস্তান এর প্রথম দশকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক জানতে পারবেন;
- পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫২)-এর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনা করতে পারবেন এবং
- পূর্ব বাংলার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঁচটি শ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা (চারটি শ্রেণীভুক্ত) চার বৎসর মেয়াদী ছিল। পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের ১৯৫১ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে প্রাথমিক স্তরে আরেকটি শ্রেণী যুক্ত করে ৬ হতে ১১ বৎসরের শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকাল (পাঁচটি শ্রেণীভুক্ত) পাঁচ বৎসর করা হয়। এ ধারা সমগ্র পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে বলবৎ ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর মেয়াদী কোর্স চালু হলে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা মাধ্যমিক ও জুনিয়র স্কুল সমূহের প্রাথমিক শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মধ্য স্কুল অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলোতে ভর্তির অসুবিধা দূর হয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক স্তরের জন্য একটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হয়। পাঠ্যক্রম ছিল নিম্নরূপ

১. মাতৃভাষা
২. গণিত
৩. সমাজ পাঠ (ইতিহাস, ভুগোল ও পৌরনীতি সমন্বয়ে)
৪. প্রাথমিক বিজ্ঞান
৫. কলা ও হস্তশিল্প
৬. শরীরবিদ্যা
৭. খেলাধূলা ও সঙ্গীত
৮. ধর্মশিক্ষা
৯. উর্দু (চতুর্থ শ্রেণী হতে)

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং তৎসঙ্গে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক বৎসর মেয়াদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিনজন শিক্ষক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন প্রধান শিক্ষকের বেতনের হার ছিল ৪৫ হতে ৬০ টাকা। সহকারী শিক্ষকদের বেতন ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা। আর শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এরূপ শিক্ষকদের বেলায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেতন ধার্য করা হত।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৫-১৯৬০) অনুযায়ী গঠিত ১৯৫৭ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক (পূর্ব পাকিস্তান সরকার) শিক্ষা কমিশন শীঘ্রই সম্ভবপর না হলেও অন্তত ১৫ বৎসরের মধ্যে ৬ হতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন

শরীফ কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ পরিমার্জন করে : মাতৃভাষা, পাটিগণিত, সমাজপাঠ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ

কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা বিদ্যালয়ের শ্রেণী ও সেকশন অনুপাতে নির্ধারণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। নির্ধারিত নীতি অনুসারে চল্লিশজন শিশুর জন্য থাকবেন একজন শিক্ষক। শিক্ষকদের ন্যুনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় প্রশিক্ষণসহ প্রবেশিকা পাশ।

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ কেন্দ্রীক সরকারে পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার আমুল সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সাধন কল্পে শিক্ষা সচিব এস এস শরীফের নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) গঠন করেন। জাতীয় শিক্ষা কমিশন আট বৎসর মেয়াদী সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। এতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা দু'স্তরে বিভক্ত থাকবে।

সার্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর

প্রথমস্তর প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরের শিক্ষা শিশুদের ৫+বৎসর বয়সে শুরু করে ১০+বৎসর বয়সে শেষ হবে। দ্বিতীয় স্তর-ষষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরের শিক্ষা ১০+হতে ১৩+বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তাবায়নের দুটি পর্যায়

কমিশনের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দু'পর্যায়ে প্রবর্তন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচ বৎসর মেয়াদী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, তার পরের পাঁচ বৎসরে এই শিক্ষা সম্প্রসারিত হবে অষ্টম শ্রেণী বা ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল-সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে যে ব্যয় হবে, তার অর্ধেক প্রাদেশিক সরকার বহন করবে। আর বাকী অর্ধেক স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া স্কুলের জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণও স্থানীয় জনসাধারণেকেই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ববাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষাক্রম

কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে গঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং উর্দূকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। তখন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তানে) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলা ভাষা
২. প্রাথমিক গণিত
৩. সাধারণ বিজ্ঞান
৪. সমাজ পাঠ
৫. ইংরেজি (তৃতীয় শ্রেণী হতে)
৬. শরীর চর্চা
৭. ধর্ম শিক্ষা
৮. চিত্রকলা ও ব্যবহারিক হস্তশিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন কত সালে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
২. প্রাথমিক শিক্ষাকাল চার বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরে কখন পরিবর্তিত হয়?
৩. ঔপনিবেশিক পূর্ব বাংলার প্রথম দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম কিরূপ ছিল?
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কিভাবে ধার্য করা হত?
৫. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কয় স্তরে বিভক্ত করার জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করেছিল?
৬. প্রাথমিক শিক্ষার অর্থায়ন কিভাবে করা হত?
৭. স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম কিরূপ ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন ।

পাঠ-২.২ পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) কর্তৃক প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলতে পারবেন;
- ▶ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯)-এর সুপারিশকৃত তিন স্তর বিশিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার স্বল্প বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ▶ পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করতে পারবেন।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এদেশের মাধ্যমিক স্তরের প্রধান ভূমিকা ছিল কেরানী তৈরি করা এবং উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের সনদ প্রদান করা। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষা জাতির বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নৈপূণ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। তাই পাকিস্তান সরকার তথা পূর্ববাংলা সরকার মাধ্যমিক স্তরকে শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার যোগাদনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা না করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসাবে বিবেচনায় এনে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশন গঠন করে শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রয়াস চালায়। এসব শিক্ষা কমিটি ও কমিশনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন ১৯৫৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছয় বৎসর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের "শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) এর সুপারিশ ছিল পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা এবং ছয় বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স চালু করা। এসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম তিন বৎসর নিয়ে জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী তিন বৎসর নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল স্থাপন করারও সুপারিশ প্রদান করে।

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রস্তাব

শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশনের আরো সুপারিশ ছিল প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর উঠিয়ে দিয়ে তিন বৎসর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স চালু করা। সমগ্র পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে ছয় বৎসরের মাধ্যমিক কোর্স এবং তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়নি।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র বেতন

কমিশন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুলসমূহে ছাত্র বেতন একই রকম রাখার প্রস্তাব করে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য দুই টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য তিন টাকা এবং নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর বেতন চার টাকা ধার্য করার উপদেশ প্রদান করে।

জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম ছিল : (১) ভাষা, (২) সমাজপাঠ, (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) গণিতশাস্ত্র (৫) ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা, (৬) চিত্রকলা, (৭) সঙ্গীত (৮) হস্তশিল্প (৯) শরীরচর্চা (১০) স্বাস্থ্য শিক্ষা। এগুলোর মধ্যে ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ এবং হস্তশিল্প হবে আবশ্যিক বিষয়। কমিশন সিনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষাক্রমে বহুমুখী শাখার প্রস্তাব করে। শাখাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

সিনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম

১. মানবিক বিভাগ (Humanities)
২. বিজ্ঞান শাখা (Science)
৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল (Industrial Arts)
৪. বাণিজ্যিক বিষয়সমূহ (Commercial Subjects)
৫. কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science)
৭. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Fine Arts)
৮. ইসলামিক শাস্ত্র (Islamic Studies)

তিনস্তর বিশিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসেবে চিহ্নিত করে একে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে গাঁটছাড়া বাধা অবস্থায় না রেখে তিনটি স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিল ।

১) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর-তিন বৎসর মেয়াদী (ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী)-১০+ থেকে ১৩+ বছর ।
২) মাধ্যমিক স্তর-দুই বৎসর মেয়াদী (নবম হতে দশম শ্রেণী)-১৩+থেকে ১৫+ বছর ।
৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-দুই বৎসর মেয়াদী (একাদশ হতে দ্বাদশ শ্রেণী)-১৫+থেকে ১৭+ বছর ।

এ সঙ্গে কমিশন বাধ্যতামূলক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত হলে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটিকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সঙ্গে একীভূত করার প্রস্তাব করে । একই ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী যা পূর্বে উচ্চ শিক্ষার অংশ হিসাবে বিবেচিত হত তাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে ।

নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৬০ সালে গঠিত 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে । ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক হিসেবে (১) মাতৃভাষা (২) ইংরেজি, (৩) গণিতশাস্ত্র, (৪) সমাজপাঠ, (৫) সাধারণ বিজ্ঞান, (৬) ধর্মশিক্ষা, (৭) শরীরচর্চা এবং (৮) চিত্রকলা ও হস্তশিল্প বিষয় নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমভুক্ত ছিল ।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

মাধ্যমিক স্তরের (নবম ও দশম শ্রেণী) শিক্ষাক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে (১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজি, (৩) সমাজপাঠ, (৪) সাধারণ গণিত শাস্ত্র এবং (৫) সাধারণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এসঙ্গে মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং কৃষি বিজ্ঞান শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভুক্ত ছিল ।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

কমিশনের সুপারিশ মতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয় । এসঙ্গে মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নার্সিং ইসলামিকশাস্ত্র শিক্ষা এবং কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগের বিষয়গুলোও শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়ন

পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ স্কুলই ছিল বেসরকারী । এসব বেসরকারী স্কুলে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ কোন স্কুলে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় স্কুলগুলো ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করতে পারত না । ফলে শিক্ষকদের বেতন থাকত খুবই কম । ফলস্বরূপ শিক্ষার মান নিম্নগামী হতে থাকে । এসব সমস্যা অনুধাবন করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করে যে স্কুলের মোট আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্র বেতন থেকে, ২০ ভাগ স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে এবং বাকী ২০ ভাগ সরকার থেকে পুরণ করা আবশ্যক ।

মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষা

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষ শ্রেণীতে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শেষে একটি জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত । মাধ্যমিক স্তরের দশম শ্রেণীর শেষে একটি চুড়ান্ত পরীক্ষা "মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হত । এভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রথম পর্ব এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা দ্বিতীয় পর্ব নামে দুটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত ।

পরীক্ষা পদ্ধতি

দীর্ঘকাল থেকে এদেশে রচনাধর্মী বহি:পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল । এতে মুখস্থ বিদ্যার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয় । ফলে উপলব্ধি, চিন্তাশক্তির বিকাশ, প্রায়োগিক দক্ষতার

উপর গুরুত্ব থাকে অপেক্ষাকৃত কম। এ কারণে কমিশন সুপারিশ করেছিল-২৫ শতাংশ নম্বর নিয়মিত পাক্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে আর ৭৫ শতাংশ শেষ পরীক্ষায় দেওয়া হবে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম ১৯৪৭ সালে সমগ্র পূর্ববঙ্গে সম্প্রসারিত হয়। পরে ১৯৬২-৬৩ সালে রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম বিভাগে আরো তিনটি বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই চারটি বোর্ড পূর্ব পাকিস্তানের চারটি বিভাগের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও চূড়ান্ত পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করত।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

পূর্ব পাকিস্তনের সাধারণ, কৃষি, স্থাপত্যও প্রকৌশল বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেশের কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার পথিকৃৎ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৬১ সালে ময়মনিসংহে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৌশল ও স্থাপত্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য ১৯৬২ সালে আহসান উল্লাহ প্রকৌশল কলেজকে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭১ এ স্বাধীনতা অর্জনের পর এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ প্রকৌশল জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধারন করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীগণ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করতেন। যে সব শিক্ষার্থী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হত এরা দুই বৎসরের বি এ বিএসসি ও বিকম ডিগ্রি লাভ করতেন।

বিএ, বিএসসি, বিকম ডিগ্রি কোর্স

তিন বৎসরের অনার্স এবং এক বৎসরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

যারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেন তারা তিন বৎসর পড়াশুনা করে বিএ (অনার্স)/বিকম (অনার্স) বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করতে পারতেন। তিন বৎসরের অনার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ এক বৎসরের এম এ/এম কম/এম এস সি ডিগ্রি অর্জন করতেন।

দুই বৎসরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

যে সব শিক্ষার্থী মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বিএ, বিকম, বিএসসি ডিগ্রি লাভ করতেন তারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যায়ন করে এম এ /এম কম এম এসসি ডিগ্রি অর্জন করতেন।

চিকিৎসা, কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা

এছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করা যেত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সম্পর্কে শিক্ষা পূর্ণগঠন কমিশন (১৯৫৭)-এর সুপারিশ কি ছিল?
২. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের বেতন সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ কি ছিল?
৩. কমিশনের সুপারিশকৃত মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম বর্ণনা করুন।
৪. জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) মাধ্যমিক শিক্ষাকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করেছিল এবং কি কি?
৫. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব বিবৃত করুন।
৬. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কি ছিল?
৭. জাতীয় শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়নের ব্যাপারে যে প্রস্তাব করেছিল তা আলোচনা করুন।
৮. স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে কয়টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল? বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নাম লিখুন।
৯. স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি কত বৎসরের ছিল?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করুন।
২. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিবরণ দিন।

পাঠ-২.৩ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব পাকিস্তানের থানা, জেলা, বিভাগীয় শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রশাসন এবং স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের দায়িত্বসমূহ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন বিবৃত করতে পারবেন।

প্রধান শিক্ষা প্রশাসক শিক্ষা সচিব

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ছিল একটি প্রাদেশিক বিষয়। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালার সমন্বয় সাধন এবং প্রদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় আংশিক অংশগ্রহণসহ প্রদেশের কোন কোন এলাকার সীমিত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করত।

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ও তার কার্যাবলি

পূর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান শিক্ষা প্রশাসক ছিলেন প্রাদেশিক শিক্ষা সচিব। তাঁর অধীনস্থ উপ-সচিব ও সেকশন অফিসারগণ প্রশাসনিক কাজে তাকে সহযোগিতা প্রদান করতেন। উল্লেখিত প্রশাসনগণ সকলেই সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত পূর্ব বাংলার সমুদয় শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা সচিব। তবে শিক্ষা ডিরেক্টরেটের প্রধান কর্মকর্তা ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (ডিপিআই) শিক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি নীতি কার্যকরী করতেন।

ডিপিআই দপ্তরের কর্মকর্তা

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর সদর দফতরে একজন জয়েন্ট ডিরেক্টর (পদটি কেবলমাত্র একজন মহিলার জন্য সীমিত সময়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল), একজন ডেপুটি ডিরেক্টর, একজন শরীরচর্চা শিক্ষা ডিরেক্টর, কয়েকজন সহকারী ডিরেক্টর এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্মচারী থাকতেন। এরা সকলেই প্রশাসনিক বিষয়ে ডিপিআইকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতেন।

বিভাগীয় শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষা প্রশাসনিক কর্মে সহায়তা প্রদান করার জন্য পূর্ব বাংলার চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারজন ডেপুটি ডিরেক্টর নিয়োজিত ছিলেন। এ সকল কর্মকর্তা সকলেই ছিলেন ডিপিআই-এর অধীনস্থ। বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরগণ নিজ নিজ বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। আবার প্রতিটি বিভিাগীয় সদর দপ্তরে ডেপুটি ডিরেক্টরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একজন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, একজন পরিদর্শিকা এবং একজনসহকারী পরিদর্শিকা নিয়োজিত থাকতেন। এরা সকলেই বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টরকে সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করতেন।

জেলা শিক্ষা প্রশাসন

জেলায় শিক্ষা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টর এর অধীনে একজন জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন বিদ্যালয়সমূহের জেলা পরিদর্শক এবং এক বা একাধিক শরীরচর্চা বিষয়ক জেলা অর্গানাইজার নিয়োজিত থাকতেন।

মহকুমা ও থানা শিক্ষা প্রশাসন

একইভাবে মহকুমা ও থানা পর্যায়েও শিক্ষা প্রশাসন বিস্তৃত ছিল। প্রতিটি মহকুমায় একজন মহকুমা শিক্ষা অফিসার এবং প্রতিটি থানায় একজন থানা শিক্ষা অফিসার এবং

সরকারি কলেজ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রশাসন

কয়েকজন সাব ইনস্পেক্টর অব স্কুল থাকতেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল মহকুমা ও থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শনসহ জেলা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

প্রাদেশিক সরকারের সরাসরি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব

সরকারি কলেজ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব এসব কলেজের প্রধান অর্থাৎ অধ্যক্ষদের উপর ন্যস্ত ছিল। তবে এরা প্রত্যেকেই আবার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর কর্তৃত্বাধীন ছিলেন। অন্যদিকে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের প্রধানগণ বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টরের অধীনে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। তবে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্যতীত সকল টিচার্স ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত।

জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ ও বিদ্যালয় প্রশাসন

অপরদিকে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাইস্কূল সমূহের প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালিত করতেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সরকার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড উভয়ের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হত। পূর্ব বাংলায় চারটি বোর্ড (ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা) নিজ নিজ এলাকার স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করত। অন্যদিকে সরকার নিজস্ব স্কুলসমূহের পরিচালন ও অন্যান্য স্কুলগুলোর অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করত। একইভাবে প্রাথমিক স্কুলগুলির অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও ছিল সরকারের।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের কর্তৃত্ব

পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করত স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডসমূহ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করত।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্বশাসন

প্রদেশের উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজস্ব আইন অনুযায়ী শিক্ষা অনুষদগুলি পরিচালন এবং স্ব-স্ব অধিভুক্ত কলেজগুলির শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করত।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও বিশিষ্ট সংস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়ভুক্ত কলেজসমূহের কয়েকজন প্রিন্সিপ্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন সদস্য এবং প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত সিন্ডিকেটই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ বডি। সিন্ডিকেট তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিশিষ্ট স্ট্যাটুটারি বডি গঠন করত।

ক) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ
খ) ফ্যাকালটিসমূহ
গ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ড সমূহ
ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী নির্বাচন বোর্ড
ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষনা কমিটি
চ) অর্থ সংক্রান্ত কমিটি
ছ) পকিল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি

এসব স্ট্যাটুটারি বডি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড সূচারুরূপে পরিচালিত করতে সহযোগিতা করত।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সমতা ও উচ্চতর শিক্ষামান বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন ও সম্মিলিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের নিমিত্তে পূর্ব বাংলার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষা পরিচালিত করত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শিক্ষা প্রশাসক কে ছিলেন?
২. ডি.পি. আই কে? তাঁর অধীনে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কি ছিল?
৩. বিভাগের শিক্ষা প্রশাসনের প্রধান কে? তার অধীনে কর্মকর্তা কারা?
৪. পূর্ব পাকিস্তানের জেলা শিক্ষা প্রশাসনের নিয়োজিত কর্মকর্তা কারা? তাদের দায়িত্ব কি ছিল?
৫. সরকারি কলেজ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের তত্ত্বাবধায়ক কে ছিলেন?
৬. পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব কি ছিল?
৭. পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সিন্ডিকেট কাদের নিয়ে গঠিত হত?
৮. বিশ্ববিদ্যালসমূহের বিশিষ্ট সংস্থাসমূহ কি?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পূর্ব পাকিস্তানের থানা শিক্ষা কাঠামো, জেলা শিক্ষা কাঠামো এবং বিভাগীয় শিক্ষা কাঠামোর একটি বিবরণ দিন।
২. পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

ইউনিট ৩

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

[Administration & Management of Primary Education in Bangladesh]

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। আর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা লাভ বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্যে সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করর জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩-এ জারিকৃত 'প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিনেন্স' এবং '১৯৭৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন'-এর আওতায় ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ ১,৫৭,৭৪২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে আত্মীকরণ করে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত মান সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করে এর প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃস্টি করে একজন মহাপরিচালককে নিয়োগ দান করা হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রথমে সর্বজনীন এবং পরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কার্যক্রম গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয় নি।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যদিও বর্তমানে কিছু গুণগত মান ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে তা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফল। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয। বর্তমান ইউনিটে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের অতীত, বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশনের সুপারিশ, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে পাঁচটি পাঠের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হলো :

পাঠ-৩.১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা

পাঠ-৩.২ : প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির বক্তব্য

পাঠ-৩.৩ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ-৩.৪ : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের প্রশাসনিক ক্ষমতা

পাঠ-৩.৫ : ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ-৩.১

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ বৃটিশ শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন;
- ▶ পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- ▶ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ধারা বর্ণনা করতে পারবেন ।

বৃটিশ শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা

বৃটিশ আমলের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা

১) এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৃটিশদের এদেশের আগমনের পূর্বে টোল, মক্তব, মাদরাসা, মাঠ, পাঠশালা, গুরুগৃহ ইত্যাদি মিলে প্রায় লক্ষাধিক প্রাথমিক বা বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান ছিল । কিন্তু এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ধারাবাহিক প্রমাণাদি সম্বলিত তথ্য জানা যায় না । এছাড়া তৎকালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

২) বৃটিশ শাসনের পূর্বে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে উঠেছিল তখনকার জমিদার, ভু-স্বামী, সমাজদরদী, শিক্ষানুরাগী বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রেরণা, অনুদান ও অর্থানুকূল্যে । জমিদারের বারান্দায়, কাচারীঘরে, গুরুগৃহে, মক্তবে, মাদরাসায় টোল, মঠ, মন্দির গাছতলা, বটতলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত । তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এলাকার জনগণের চাহিদাভিত্তিক । তাই শিক্ষাদরদী অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের শিক্ষা পরিচালিত হত ।

৩) বৃটিশ শাসনামলে ১৮৮২ সালে প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ হয় । বৃটিশ ভারতের এই রিপোর্টে এদেশের প্রাথমিক (Elemen:ary) শিক্ষা মাতৃভাষায় শেখানো ও শিক্ষা প্রসারের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় । ১৮৮২ সালের প্রায় ৩৮ বছর পর ১৯১৯ সালে তৎকালীন শাসকবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করণের লক্ষ্যে Bengal Primary Education Act-1919 এবং ১৯৩০ সালে Bengal Rural Primary Education Act জারি করে । কিন্তু মহাযুদ্ধের কারণে তার বাস্তাবায়নের কাজ বন্ধ হয় বলে উল্লেখ করা হয় ।

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন জমিদার ভু-স্বামীগণ এবং শিক্ষা দরদী অভিভাবকগণ যৌথভাবে । বৃটিশ শাসনামলে বৃটিশরা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করত ।

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের শিক্ষা সম্মেলনে ৬-১১ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৫১ সাল থেকে দশ বছর সময়ের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ।

প্রশাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর থেকে ৫ বছর করা হয় । দশ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক স্কীমের আওতায় ৫.০৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । ১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ কার্যক্রমটি পরিত্যক্ত হয় । বর্তমান জেলা ও থানা পর্যায়ে যে প্রাথমিক কাঠামো চালু রয়েছে তা ১৯৬১ সালে সৃষ্টি হয়েছিল ।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

১৯৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে দেশের ৩৬,১৬৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয় এবং সেসঙ্গে ১,৫৭,৭৪২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে আত্মীকরণ করা হয়। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষ করে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নবযুগের সূচনা হয়। ১৯৮১/৮৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয়। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখী ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন

১. ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা "প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর" স্থাপন এবং অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়।

২. ১৯৮৩ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ময়মনসিংহে স্থাপন করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি

৩. দেশের ৬৪টি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ৬৪টি সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। থানা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থাৎ একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য ২,১৩৪টি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগদান করা হয়।

৪. দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি

৫. বিদ্যালয়ভিত্তিক শ্রেণী শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিমাসে ক্লাস্টার ট্রেনিং প্রবর্তন করা হয়েছে।

৬. ১৯৮৬ সালে ১০০০ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে।

৭. স্কুল গৃহ নির্মাণ ও মেরামত কাজ তদারকির জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে যথাক্রমে সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশল পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে।

৯. প্রাথমিক স্তরের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়েছে।

১০. স্যাটেলাইট বিদ্যালয় কার্যক্রমের আওতায় ২০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করে ১ম ও ২য় শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়েছে।

রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়

১১. সারাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৭ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিটিতে চার জন করে শিক্ষককে মাসিক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠের মাধ্যমে জানব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৃটিশদের আগমনের পূর্বে এদেশে কোথায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত?
২. বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় কারা উদ্যোগী ছিল?
৩. বৃটিশ শাসনামলে কখন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং কি শিক্ষাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।
৪. এদেশের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা কোন দলিল থেকে জানতে পারি?
৫. বৃটিশ শাসনামলে পল্লীবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট থেকে জানতে পারি?
৬. ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?
৭. ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুইটি বিপরীতমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা কি?
৮. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৭৪ সালে গৃহীত দুটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ কি?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃটিশ শাসনামলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন ।
২. ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচিত লিখুন ।
৩. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের ধারা লিখুন ।

পাঠ-৩.২

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির বক্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ইস্ট পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) এর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শরীফ শিক্ষা কমিশনের (১৯৫৯) প্রস্তাবসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) প্রস্তাবসমূহ বিবৃত করতে পারবেন;
- প্রাথমিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৮ এর সুপারিশের বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭-এর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।

ইস্ট পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৭) : প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধীয় সুপারিশ

শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশনের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশ

১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসকরণের লক্ষ্যে তৎকালীন এই প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী প্রয়াত জনাব আতাউর রহমান খানকে প্রধান করে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে যা এই কমিশন ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে্ ইস্ট পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন "আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন" নামে পরিচিত। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক সুপারিশ রাখে। সুপারিশের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হল :

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সরকারের দায়িত্ব এ মর্মে একটি legislative act করা হয় যা "East Pakistan Primary Education Act" নামে পরিচিত।

২. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য "Sub-divisional Adviory Board of Primary Education" গঠন করা হয় এবং একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ দান করা হয়। এই বোর্ড প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কাজ করে যার চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী এবং সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন পরিচালক শিক্ষা।

৩. যেহেতু মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের ইউনিট সে কারণে মহকুমা শিক্ষা অফিসারের পদটি গেজেটেড পদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়।

৪. Sub-inspector of Schools পদটি বিলোপ করে তৎপরিবর্তে "Circle Education Officer" পদে রূপান্তর করা হয়।

৫. "Inspector of Training Institution" পদটি সৃষ্টি করে শিক্ষায় দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগদানের লক্ষ্যে পদটি ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত করা হয়।

৬. পিটিআই সুপারের ফ্রি আবাসন প্রদানের ব্যবস্থা করা নতুনবা মাসিক ৫০ টাকা হারে বাড়ি ভাড়া প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের ২৫ ভাগ গেজেটেড করা, শতকরা ৩৩ ভাগ টিচিং ও ইন্সপেকটিং পদে সরাসরি বহিরাগতদের নিয়োগ দান, প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শরীফ শিক্ষা কমিশনের (১৯৫৯) প্রস্তাবসমূহ

১) শরীফ শিক্ষা কমিশন থেকে জানা যায় যে, এর পূর্বে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হত। শরীফ কমিশন গঠনের কিছুকাল পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত পাকিস্তানের প্রাথমিক স্কুলসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থা সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় শরিফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

২) প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য শরীফ শিক্ষা কমিশন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মহকুমাকে ইউনিট হিসেবে গণ্য করে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ইউনিট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হত। কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

- ডেপুটি কমিশনার কিংবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি -চেয়ারম্যান
- জেলা শিক্ষা অফিসার -সদস্য সচিব
- অন্য তিনজন ব্যক্তি -সদস্য

এই কমিটি প্রাথমিক স্কুলসমূহ পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর দায়িত্ব পালন করত।

পরিচালন কার্যের সুবিধার্থে প্রায় দশ হাজার লোক অধ্যুষিত এলাকার জন্য একটি ক্ষুদ্র ইউনিট থাকত যার চেয়ারম্যান-ডেপুটি কমিশানর বা তার মনোনীত ব্যক্তি এবং অন্য দুইজন ব্যক্তি এর সদস্য। এই ক্ষুদ্র কমিটিকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় যেমন- (১) এলাকার ভেতেরে শিক্ষকের বদলী ও (২) পরিচালন সংক্রান্ত শৃংখলা বা শাস্তিমুলক কিছু ব্যবস্থা।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) প্রস্তাব

স্বাধীনতা পূর্বকালে শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামান্য রদবদল ছাড়া কোন সামগ্রিক কার্যকর পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীন দেশ ও সমাজের চাহিদা মাফিক শিক্ষা সংস্কার না হয়ে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সে কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনকি পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব বিচেনা সামনে রেখে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব করে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১. প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে স্বায়ত্বশাস্তি সংস্থা "জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ" গঠন করতে হবে। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ, শিক্ষা কার্যে রত শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়।

এই কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সদস্য হবেন যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ এবং পূর্ণকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসক। অফিস পরিচালনার জন্য থাকবেন সহায়তা সাভিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

২. প্রাথমিক স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও পরিদর্শিকার নিয়োগদান।

৩. প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষাবিদগণের নিয়োগ দান। যদিও বর্তমানে জেলার থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলীর ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও থানা অফিসার।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করে আজ পর্যন্ত তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মফিজ উদ্দিন আহমদ শিক্ষা কমিশনের (১৯৮৮) প্রস্তাব

১৯৮৮ সালের "বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন" যথার্থই উল্লেখ করেছে-

"সুষ্ঠু ও উন্নত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি দ্রুত লক্ষ্য রেখে স্বাধীনতা পূর্বকালে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য নানাবিধ সুপারিশ রাখে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন বিশেষ কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।"

তাই বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যে সব সুপারিশ করে তার প্রধান প্রধান দিক এখানে উল্লেখ করা হল :

থানা শিক্ষা কমিটি

নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি থানা (উপজেলা) শিক্ষা কমিটি গঠন করা হবে যার সভাপতি হবেন জেলাস্থা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, সদস্য সচিব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, একজন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১জন, পিটিআই সুপার, সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ জন শিক্ষানুরাগী।

কমিটির কর্মকাণ্ড

এই কমিটি থানার চাহিদামাফিক নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ, বদলী, সহকারী থানা অফিসারদের মটর সাইকেল প্রদান, বেতন স্কেল সমন্বয়, প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও মূল্যায়ন, পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল কার্যাদিতে সহায়তা প্রদান করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির (১৯৯৭) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে "জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি" বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার নিরীখে যথার্থই উল্লেখ করেছে :

"সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশদের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল প্রশাসন কাঠামো।"

প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের পর পরই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর সরকার ১৯৮৩ সারে জারিকৃত এক আদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় নীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচি প্রণয়ন ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর পদমঞ্জুরী ও পদসৃষ্টি, বেতনভাতা, অবসর গ্রহণ, পেনসন, গ্রাচুইটি, শিক্ষকদের আন্তঃথানা বদলি ইত্যাদি সরকারের দায়িত্বরূপে চিহ্নিত করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কিছু বিষয়াদি উপজেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান, বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের কার্যাবলি দেখাশোনা

করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং রেজিস্ট্রেশনের বিষয়গুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। থানা শিক্ষা কমিটি ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি (১৯৯৭) এর সুপারিশগুলো হল-

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ৯৭ এর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় সুপারিশ

- পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে আট বছরে উন্নীত করা প্রয়োজন।
- প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয় স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বায়তশাসিত সংস্থার নিকট অর্পণ করা যায়।
- কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নীতি নির্ধারণ ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ের বিষয় হিসেবে থাকতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ একটি স্বতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সরকারি বেসরকারি সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিভিন্ন নিয়োগবিধি প্রবর্তন করা যায়। যে কোন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ বিধিমালা পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।
- প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, সমীক্ষা, এ্যকশন রিসার্চ, পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ যাবতীয় তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের বিষয়টি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি পরিচালনা করতে পারে। এই লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে শক্তিশালি করা এবং বিভাগীয় শাখা স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।
- স্বতন্ত্র একটি প্রাথমিক শিক্ষা সাব-ক্যাডার প্রবর্তন করতে হবে।
- প্রত্যাহিক পাঠদান, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, ছোটখাট মেরামত এবং বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে প্রদান করতে হবে।
- বর্তমানে শিক্ষকদের থানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আন্তঃথানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ বিদ্যালয় ভর্তি হতে পারে সে জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে বিশেষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দায়বদ্ধ করতে হবে। ৫০% উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাত্যাহিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার, শাস্তি এবং অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইস্ট পাকিস্তান শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশনের প্রধান কে ছিলেন এবং কত সালে তা গঠিত হয়েছিল?
২. Inspector of Training Institution কোন সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল?
৩. শিক্ষা প্রশাসনের ও টিচিং পদে কোটা সম্বন্ধীয় বিবরণ কোন রিপোর্টে আমরা জানতে পারি?
৪. প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় শরীফ কমিশন কি সুপারিশ ছিল?
৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন কার সুপারিশ ছিল?
৬. নয় সদস্য বিশিষ্ট থানা (উপজেলা) শিক্ষা কমিটি গঠন সম্পর্কিত সুপারিশ কোন কমিশন করেছিল?
৭. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৯৭ সাল একটি স্মরণীয় ঘটনা- ব্যাখ্যা করুন ।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন কি সুপারিশ করেছে?
২. শরীফ শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কি প্রস্তাব করেছিল?
৩. প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কি কি?
৪. "জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি- ১৯৯৭" এর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় সুপারিশগুলো কি?

পাঠ-৩.৩ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ▶ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিবৃত করতে পারবেন;
- ▶ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ▶ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় থানা কমিটির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সর্বোচ্চে অবস্থিত । এখানে উল্লেখ্য যে যে, বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুইটি বিভাগ রয়েছে, (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং (২) শিক্ষা বিভাগ । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন প্রতিমিন্ত্রী । প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন সচিব । তিনি এই বিভাগের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অপিসার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- ♦ জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এতদবিষয়ক বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ♦ শিক্ষক ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পেশাগাত উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- ♦ নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদান;
- ♦ শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পদ সৃষ্টি করা;
- ♦ প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জুরীর জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ;
- ♦ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, ভাতা, পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির জন্য রবাদ্দ প্রদান;
- ♦ বাৎসরিক শিক্ষা বাজেট তৈরি ও বরাদ্দ প্রদান;
- ♦ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
- ♦ জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;
- ♦ দুই কোটি টাকার মধ্যে সীমিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ♦ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- ♦ শিক্ষার উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি ও কমিশন নিয়োগ;
- ♦ বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মানের সমতা বিধান;
- ♦ ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি বা অবসর প্রদান;
- ♦ বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ নির্ধারণ এবং
- ♦ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো

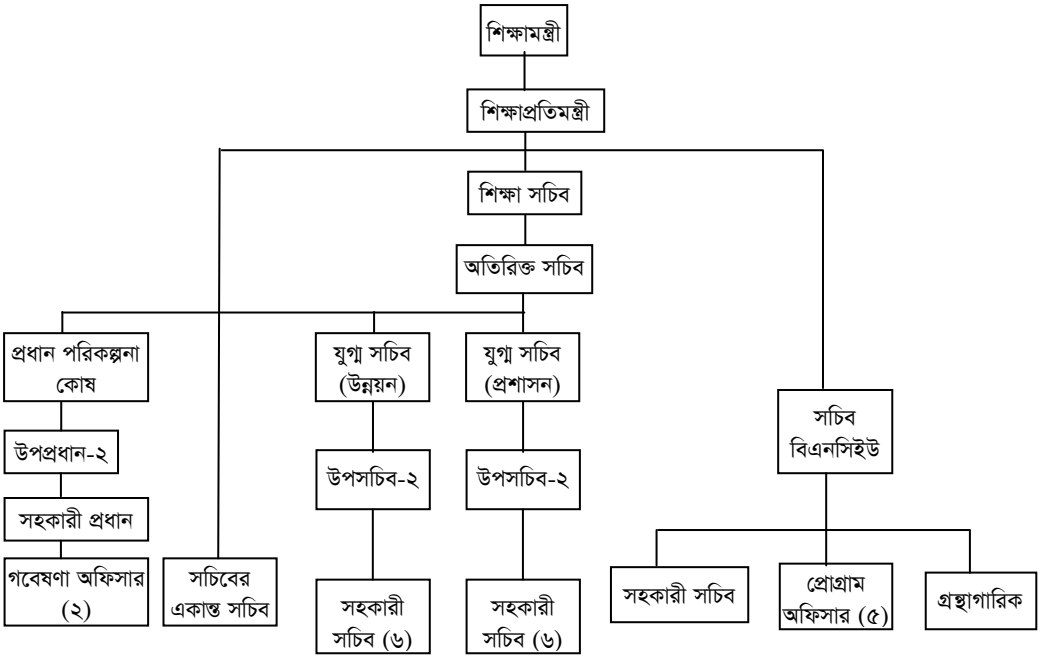

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক) ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাস্তবায়ন সংস্থা (Implementing Directorate)। এই অধিদপ্তর এবং এর অধঃস্তন অফিসসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য দায়ী থাকে।

খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্যের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলির টেকনিক্যাল সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দান করাও অধিদপ্তরের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন;
- সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য অধিদপ্তরের প্রতিটি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরকারি নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান;
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী নিয়মাবলি (Standing orders) জারি।
- অধিদপ্তরের অধীন অফিসসমূহের কার্যাবলির তদারক করা;
- থানা/উপজেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান;
- বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন ও এতদসম্পর্কিত প্রশাসন ও ব্যবস্থা;
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শদান;
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা;

- প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (NAPE) এর প্রশাসন ও উন্নয়ন;
- অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি;
- অধিদপ্তরের অধীন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং শৃংখলা বিষয়ক কার্যসম্পাদন এবং
- আন্তঃঅধিদপ্তর যোগাযোগ ।

অধিদপ্তরের সংগঠন

প্রশাসনিক কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হলেন একজন মহাপরিচালক। অধিদপ্তরের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসকে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও থানায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন অফিসসমূহের একটি ছাক নিম্ন দেওয়া হল :

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো

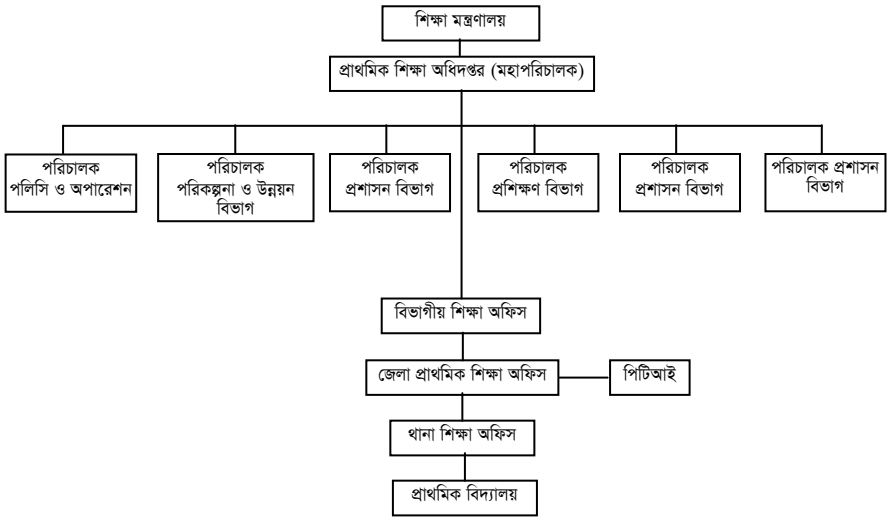

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মোট জনবল ১০,১৭৯ জন। নিম্নে জনবলের (শিক্ষক ব্যতীত) বিভাজন দেওয়া হল :

	অফিস	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	ডিজি অফিস	১১৮ জন	১৮৩ জন	৩০১ জন
২.	নেপ	৪৫ জন	৪০ জন	৮৫ জন
৩.	পিটিআই	৭৩৬ জন	৭৯৪ জন	১,৫৩০ জন
৪.	বিভাগীয় অফিস	১৫ জন	৪৫ জন	৬০ জন
৫.	জেলা অফিস	২০০ জন	১,৯৫৫ জন	২,১৫৫ জন
৬.	থানা অফিস	২,৫৫০ জন	৩,৪৯৮ জন	৬,০৪৮ জন
		৩,৬৬৪ জন	৬,৫১৫ জন	১০,১৭৯ জন

থানা শিক্ষা পরিষদ

সরকার প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করে ১৯৮২ সালে থানা পরিষদ গঠন করেছে। পরিষদের চেয়ারম্যান জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত। পরিষদ সর্বপ্রকার উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাথমিক শিক্ষা থানা পরিষদের কাছে একটি হস্তান্তরিত বিষয়। সরকার থানা

পরিষদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্ব অর্পণ করেছে:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি এবং থানার অভ্যন্তরে বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- থানার প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট তৈরি করা ও সরকারের কাছে পেশ করা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পেশ করা এবং অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়িত করা;
- সরকারের গৃহীত নীতি অনুযায়ী পূর্ব অনুমতি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ও আঙ্গিনা সংরক্ষণ করা এবং বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করা ও সনদপত্র প্রদান করা;
- মেধাবী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা এবং
- পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ এবং বণ্টন নিশ্চিত করা ।

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি

থানা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির কাজ

থানা পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য ৮ থেকে ১০ জন সদস্য নিয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি রয়েছে। থানা পরিষদ চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এ কমিটর চেয়ারম্যান। থানা নির্বাহী অফিসার পদাধিকার বলে ভাইস চেয়ারম্যান। থানা শিক্ষা অফিসার পদাধিকার বলে এ কমিটির সদস্য সচিব। থানা ইঞ্জিনিয়ার এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান (যেখানে আছেন) পদাধিকার বলে সদস্য। এছাড়া আরও পাঁচজন মনোনীত এবং নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। এরা হলেন একজন শিক্ষানুরাগী, একজন মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষিকা, একজন প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানদের নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান।

প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ম্যানেজিং কমিটি আছে। ম্যানেজিং কমিটি ৭ জন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য দ্বারা গঠিত। সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব। ম্যানেজিং কমিটি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে :

- বিদ্যালয়ের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করা;
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা এবং
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা অফিস

জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রধান দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষকদের আন্ত:উপজেলা/থানা বদলিকরণ। তদ্রুপ বিভাগীয় স্তরে নিয়োজিত উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব বিভাগ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন, পরিদর্শন এবং শিক্ষক কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের আন্তঃজেলা বদলিকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি?
২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়?
৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো লিখুন।
৪. থানা শিক্ষা পরিষদের কাঠামো সংক্ষেপে লিখুন।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্ষেপে লিখুন।
২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি বিবৃত করুন।
৩. থানা শিক্ষা পরিষদ ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির কাজের বিবরণ দিন।

পাঠ-৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের প্রশাসনিক ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► পরিচালক প্রশাসনের ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ► পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রশাসনিক ক্ষমতার বিবরণ দিতে পারবেন;
- ► পরিচালক প্রশিক্ষণের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন;
- ► পরিচালক মনিটরিং ও ইভালুয়েশন এর প্রশাসনিক ক্ষমতা কি কি তা বলতে পারবেন এবং
- ► পরিচালক পলিসি ও অপারেশনের প্রশাসনিক ক্ষমতা বর্ণনা করতে পারবেন ।

ক্ষমতা

পরিচালক প্রশাসনের ক্ষমতা

১. সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দের আন্তঃবিভাগীয় বদলির কেইজগুলো নিস্পত্তি করা;
২. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ শৃঙ্খলা ভঙ্গের কেইজগুলো নিস্পত্তি করা;
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, সুপার ও সহকারী সুপার পিটিআই এবং অন্যান্য সমমানের পদের ছুটি অনুমোদন করা;
৪. অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে সহকারী পরিচালক ও তার সমপদের কর্মকর্তাদের ভ্রমণ বিল পাস করা;
৫. অধিদপ্তরের স্টোরের ৫০,০০০/- টাকার স্টেশনারীর ক্রয় করা;
৬. অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের এবং স্টাফদের জিপিএফ এর অনুমোদন প্রদান করা;
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপারদের আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের কেইজগুলো নিস্পত্তি করা;
৮. দেশের অন্যান্য দপ্তরের নিয়োগ লাভের জন্য ১ম শ্রেণীর অফিসারদের আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা ।
৯. তাঁর অধীনস্থ সহকারী পরিচালকবৃন্দের ACR লেখা এবং
১০. উপ-পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ACR গুলো প্রতিস্বাক্ষর করা ।

পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষমতা

পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষমতা

১. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ সম্বন্ধীয় অভিযোগ ও দোষারোপ পত্র নিস্পত্তি করা;
২. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী পরিবহণের ব্যয় মেটানোর তহবিল বরাদ্দ করা;
৩. উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্বন্ধীয় তথ্য বিবরণী পরিকল্পনা কোষ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা;
৪. পরিকল্পনা শাখার নন গেজেটেড এবং প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন করা;
৫. অধীনস্থ সহকারী পরিচালকদের ACR লেখা;
৬. অধীনস্থদের দায়িত্ব বণ্টন করা এবং
৭. উপ-পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ACR সমূহ প্রতিস্বাক্ষর করা ।

পরিচালক প্রশিক্ষণের ক্ষমতা

পরিচালক প্রশিক্ষণের ক্ষমতা

১. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এ যোগদানের জন্য অংশগ্রহণ নির্বাচন করে মনোনয়নের ব্যবস্থা করা;

২. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কসপ-এ যোগদানের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার ও পিটিআই ইনস্টাক্টরদের প্রেষণে অনুমোদন দান করা;
৩. প্রশিক্ষণ শাখার নন গেজেটেড স্টাফ এবং প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের নৈমিত্তিক ছুটির অনুমোদন;
৪. পরিচালক প্রশিক্ষণের নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য পদের অফিসারদের ACR লেখা;
৫. অধীনস্থ অফিসারবৃন্দের কার্য বণ্টন করা;
৬. উপ-পরিচালক কর্তৃক পুরণকৃত ACR প্রতিস্বাক্ষর করা এবং
৭. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা ।

ক্ষমতা

পরিচালক মনিটরিং ও ইভালুয়েশন-এর ক্ষমতা

১. অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
২. অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় যোগান প্রদান করা;
৩. নিয়ন্ত্রণাধীন নন গেজেটেড ও প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন করা;
৪. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন শাখার বিভিন্ন কার্যাদির প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা;
৫. পরিচালক মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন নিয়ন্ত্রাধীন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য অফিসারদের ACR লেখা;
৬. উপ-পরিচালক কর্তৃক পূরণকৃত ACR প্রতিস্বাক্ষর করা এবং
৭. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত দায়িত্ব পালন করা ।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-৩.৪

অ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক প্রশাসন কোন কোন ক্ষমতার অধিকারী তা বিবৃত করুন ।
২. পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা উল্লেখ করুন ।
৩. পরিচালক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিবৃত করুন ।
৪. পরিচালক মনিটরিং ও ইভালুয়েশন কি দায়িত্ব পালন করেন তার বিবরণ দিন ।

পাঠ-৩.৫ ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন স্থাপনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► একাডেমী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► একাডেমীর বোর্ড অব গভর্নরস-এর গঠন কাঠামো বিবৃত করতে পারবেন;
- ► একাডেমীর বিভিন্ন বিভাগগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ► একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন ।

একাডেমী স্থাপনের ঐতিহাসিক পটভূমি

NAPE স্থাপনের ঐতিহাসিক

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন আগ থেকে অনুভূত হয়ে আসছিল। এতদবিষয়ে ড. কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন যথার্থই উল্লেখ করেছিল:

"প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাতীয় বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যের জন্য এবং দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়াসকে সুসমন্বিত করবার উদ্দেশ্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা দরকার ।"

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ও প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে রাজধানী শহর ঢাকা থেকে ১২০ কিমি উত্তরে ময়মনসিংহে "National Academy for Primary Education (NAPE)" প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান NAPE এর পূর্ব নাম ছিল "Academy for Fundamental Education বা মৌলিক শিক্ষা একাডেমী। এই একডেমী স্থাপনের মূল লক্ষ্য হল একে প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা ।

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। যেমন-(ক) একাডেমীক কার্যাদির মান উন্নয়ন এবং (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় নবতর ধ্যান ধারণা সম্পর্কে শিক্ষক, প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক এবং পরিদর্শকবৃন্দকে স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান ।

নিম্নে প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল :

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- ♦ পিটিআই স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- ♦ পরীক্ষণ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- ♦ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

২. পেশাগত তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনা

- ♦ সরকারী পিটিআইসমূহের শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা ।
- ♦ প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ক্রার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পিটিআই স্টাফ ও অন্যান্যদের পরিচালনা ও সহায়তা প্রদান ।

৩. মনিটরিং ও মূল্যায়ন

- ভ্রাম্যমান টীমের মাধ্যমে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যায়ন এবং ফিডব্যাক সংগ্রহ করা। সংগৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং তদনুযায়ী পরবর্তী প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।
- বিভিন্ন সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মনিটরিং এবং এসবের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য পলিসি, স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা।

৪. রিসার্চ এন্ড রিসার্চ সেন্টার

- দেশে ও বিদেশে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষা সামগ্রী দেশের পিটিআই তত্ত্বাবধায়ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সরবরাহ করা।
- প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জড়িত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদদের নিয়ে সমাবেশ, সেমিনার ও কর্মশিবিরের আয়োজন করা।

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য উপকরণ তৈরি করা।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা ও উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রগতি মনিটরিংসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কি প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন তা লিপিবন্ধ করা।
- শেষ পর্যায়ে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিপূরক সম্পর্ক উন্নয়নের দ্বারা সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ সুবিধা বর্ধিত করা।

একাডেমীর বোর্ড অব গভর্নরস-এর গঠন কাঠামো

NAPE-এর বোর্ড অব গভর্ণরর্স এর কাঠামো

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই একাডেমীর কার্যক্রম একটি উচ্চ ক্ষামতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস দ্বারা পরিচালিত হয়। NAPE-এর বোর্ড অব গভর্নরর্স **১১** জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। একাডেমীর বোর্ড অব গভর্নরর্স এর দায়িত্ব নিম্নরূপ :

১.	চেয়ারম্যান	- সচিব (প্রাইমারী ও গণশিক্ষা বিভাগ)
২.	ভাইস চেয়ারম্যান	- মহাপরিচালক ডিপিই
৩.	সদস্য	- অতিরিক্ত সচিব PMED
৪.	সদস্য	- পরিচালক IER, DU
৫.	সদস্য	- সদস্য শিক্ষাক্রম, NCTB
৬.	সদস্য	- পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ
৭.	সদস্য	- খ্যাতনামা একজন শিক্ষাবিদ
৮.	সদস্য	- খ্যাতনামা সাক্ষরতা বিষয়ক শিক্ষাবিদ
৯.	সদস্য	- পিটিআই সুপার (একজন)
১০.	সদস্য	- ময়মনসিংহ সদর দক্ষিণের থানা শিক্ষা অফিসার
১১.	সদস্য	- পরিচালক, নেপ

NAPE-এর বোর্ড অব গভর্নরস নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রদান করে থাকে :

- বার্ষিক পলিসি প্রণয়ন ও অনুমোদন;
- বার্ষিক কার্যক্রম প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি/প্রক্রিয়া অনুমোদন ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা দান ।

NAPE-এর প্রশাসনিক কাঠামো

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থায়ী পদসহ একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে । যেমন-NAPE-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-একজন পরিচালক । পরিচালকের কাজে সহায়তা করার জন্য তার অধীন রয়েছেন দুইজন উপপরিচালক, যেমন (১) উপ-পরিচালক প্রশাসন এবং (২) উপ-পরিচালক প্রশিক্ষণ । একাডেমিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য রয়েছেন ১১ জন বিশেষজ্ঞ এবং ২২ জন সহকারী বিশেষজ্ঞ, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা এবং ১ জন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক । এছাড়া রয়েছেন ১ জন ক্যাম্পাস তত্ত্বাবধায়ক এবং অফিস সহকারী ৪ জন, টাইপিস্ট ৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১০ জন ।

উপরোক্ত কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্মচারির সমন্বয়ে NAPE-এর যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে ।

NAPE-এর বিভাগসমূহ

এই একাডেমীর বিভাগসমূহ নিম্নরূপ :

১. **ফাউন্ডেশন বিভাগ**
   - শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
   - গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান
২. **মানবিক বিভাগ**
   - বাংলা
   - ইংরেজি
   - সমাজবিজ্ঞান
৩. **গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগ**
   - গণিত
   - বিজ্ঞান ও গ্রামীণ বিজ্ঞান বিভাগ
৪. **চারু-কারু ও গ্রাফিক আর্টস বিভাগ**
৫. **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়ন বিভাগ**
৬. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগ**
   - প্রশিক্ষণ
   - যোগাযোগ
৭. **গ্রন্থাগার ও দলিল সংরক্ষণ (ডকুমেন্টশন) বিভাগ**
৮. **সি-ইন-এড পরীক্ষা বোর্ড**

NAPE-এর বর্তমান কার্যক্রম

কার্যক্রম

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন নিম্নোক্ত প্রধান কার্যাদি পরিচালনা করছে :

- পিটিআই-এর প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ইত্যাদি;
- পিটিআই পরিচালিত সি-ইন-এড এর পরীক্ষা পরিচালনা ও ফল প্রকাশ;
- পিটিআইতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও প্রশিক্ষণ দান;

- ডিপিই-এর অধীন কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ দান;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংগ্রহ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সেগুলো প্রয়োগ/ব্যবহার করা;
- সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা এবং
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নানা ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন কি বলেছিল?
২. নেপ কখন, কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? নেপ এর পূর্ব নাম কি ছিল?
৩. নেপ এর প্রধান চারটি কাজ কি?
৪. নেপ এর বোর্ড অব গভর্নরর্স এর কার্যাদি লিখুন ।
৫. নেপ এর একাডেমিক বিভাগগুলোর নাম লিখুন ।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. নেপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করুন ।
২. নেপ এর বোর্ড অব গভর্নরস এর গঠন কাঠামো উল্লেখ করুন ।
৩. নেপ এর একাডেমিক বিভাগ উল্লেখপূর্বক বর্তমান কার্যক্রমের বিবরণ দিন ।

ইউনিট ৪

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
[Administration and Management of Secondary Education]

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সমন্বিত এবং সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে শিক্ষা কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবীয় উপাদান এবং বস্তুগত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া, আর এ সম্পর্কিত নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হল প্রশাসন।

মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় এবং অত্যান্ত গুরত্বপূর্ণ ধাপ। এ স্তরেই উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর অনেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদে পরিণত হয়। অতএব গুরুত্বের বিবেচনায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ভূমিকা বির্তকের উর্ধ্বে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর অধীনে রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা যেগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। উদাহরণস্বরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধীদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশাসনিক নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওপর। শিক্ষা বোর্ডসমূহ পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে নায়েম মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বর্তমান ইউনিটে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখিত **১২**টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় এর মাধ্যমে এম এড প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং দিক নির্দেশনা লাভে সমর্থ হবেন।

পাঠ-৪.১ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো
পাঠ-৪.২ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পাঠ-৪.৩ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পাঠ-৪.৪ ঃ মাউশির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা
পাঠ-৪.৫ ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
পাঠ-৪.৬ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
পাঠ-৪.৭ ঃ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
পাঠ-৪.৮ ঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
পাঠ-৪.৯ ঃ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো

পাঠ-৪.১ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

[Administration and Organisational Structure of Secondary Education]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিবৃত করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানমূহের দায়িত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারবেন ।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক খাতসমূহের মধ্যে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । কারণ শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার । শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে । মানুষের এই মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় উপায় নির্দেশের লক্ষ্যে গত এক দশকে দুটি বিশ্ব সম্মেলন, যোমতিয়েন ১৯৯০ এবং ডাকার ২০০০ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সম্মেলন, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদিতে শিক্ষাকে সকল প্রকার উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় উপায় গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে । কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ছয় ভাগের একভাগ এবং বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক লোক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত এবং জাতিকে সুশিক্ষিত করতে হলে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা । আর যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনা ও কার্যকর বাস্তবায়নে সফল শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম । বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কথা অধিকতর প্রযোজ্য । কারণ এ স্তরের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান সম্পর্কে ইতোমধ্যে জনমনের নানাধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । এ দুটি দিকের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো হতে হবে যুগোপযোগী, কার্যকরী ও বাস্তাব চাহিদা ভিত্তিক । নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য আমরা সংক্ষেপে জানতে পারব ।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত । শিক্ষাখাতেও এই কেন্দ্রীভুত প্রশাসন লক্ষণীয় । বর্তমানের বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যদিও কাঠামোগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে (যেমন আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিস) তথাপি ক্ষমতা চর্চার দিক থেকে তা মূলত কেন্দ্রীভূত । এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক প্রশাসন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে । নিম্নে সংযোজিত ছকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো তুলে ধরা হল ।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো

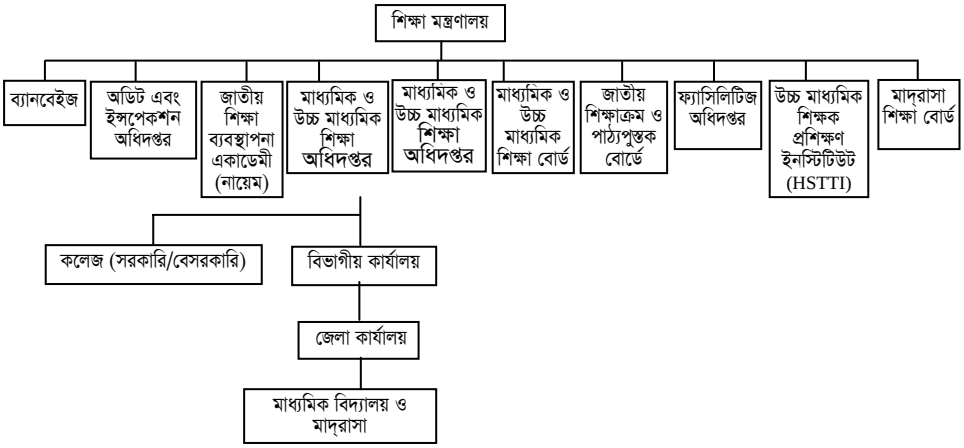

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দায়িত্ব

ওপরের ছকে লক্ষণীয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে একাধিক সংস্থা । কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবস্থিত এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে । তবে কোন কোন সংস্থার, যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় অফিস রয়েছে । শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালনে এসব আঞ্চলিক ও স্থানীয় অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের । তবে কোন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা একক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয় । কারণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো । মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার এসব বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালন করে থাকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চার ধরনের বিশেষীকৃত সংস্থা । নিচের ছকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এদের দায়িত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ।

প্রতিষ্ঠান	দায়িত্ব
ক) অংগ অধিদপ্তর : ১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (সাধারণ) ও মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
খ) সংযুক্ত/স্বতন্ত্র দপ্তর : ১। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ২। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী	-শিক্ষা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা । -শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজন ।
গ) পরিদপ্তর : ১। শিক্ষা ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট ২। ডাইরেক্টরেট অব অডিট এ্যান্ড ইন্সপেকশন ।	-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাপনা
ঘ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান : ১। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিয়মকানুন ও একাডেমিক পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা । -শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবস্থাপনা । -শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ।

উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছে আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান । পরবর্তী পাঠগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিকতর বিস্তৃত পরিসরে জানা যাবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন) ।

১ । মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চে কার অবস্থান?

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়

খ) মন্ত্রী পরিষদ

গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

২ । শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার?

ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

খ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী

গ) ডাইরেক্টরেট অব অডিট এ্যান্ড ইন্সপেকশন

ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন ।

২ । মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও দায়িত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করুন ।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন ।

২ । শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভুত প্রশাসন শিক্ষার উন্নয়নে কতটা সহায়ক? আপনার মতামত যুক্তিসহকারে লিখুন ।

সঠিক উত্তর

১ । ক, ২ । ঘ

পাঠ-৪.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
[Ministry of Education]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিবৃত করতে পারবেন ।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা জেনেছি বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় । মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব । এছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যা লাইন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত রূপরেখায় বাস্তবায়িত হবে তাও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয় । শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়াবলিও সুরাহা করে । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি পরিকল্পনা কোষ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো । এদের সহায়তায় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন অংগ অধিদপ্তর, সংযুক্ত/স্বতন্ত্র অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক তথা জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে ।

প্রশাসনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাঠামো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী । রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কারণে মন্ত্রীর অবস্থান অস্থায়ী বা সাময়িক । কাজেই মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে যার প্রধান হলেন সচিব । সচিবকে সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব, তিনজন যুগ্ম সচিব, ছয় জন উপসচিব এবং ১৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষণের মাধ্যমে অনুমোদনের সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি পরিকল্পনা কোষ । পরিকল্পনা কোষে রয়েছেন একজন কোষ প্রধান যিনি যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন । এছাড়া রয়েছেন দু'জন উপপ্রধান (উপসচিবের পদমর্যাদার অধিকারী), দু'জন সহকারী প্রধান এবং পাঁচজন গবেষণা কর্মকর্তা । ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোভুক্ত আরেকটি সংস্থা যার প্রধান হলেন একজন সচিব যিনি উপসচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন । তাঁর কর্মে সহায়তার জন্য আছেন একজন সহকারী সচিব, পাঁচজন প্রোগ্রাম অফিসার ও একজন গ্রন্থাগারিক । এছাড়া সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে সহায়তার জন্য রয়েছেন কয়েকজন করে কর্মচারী । পরবর্তী পৃষ্ঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর ছক এক নজরে দেখে নিই ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ)-এর সাংগঠনিক কাঠামো

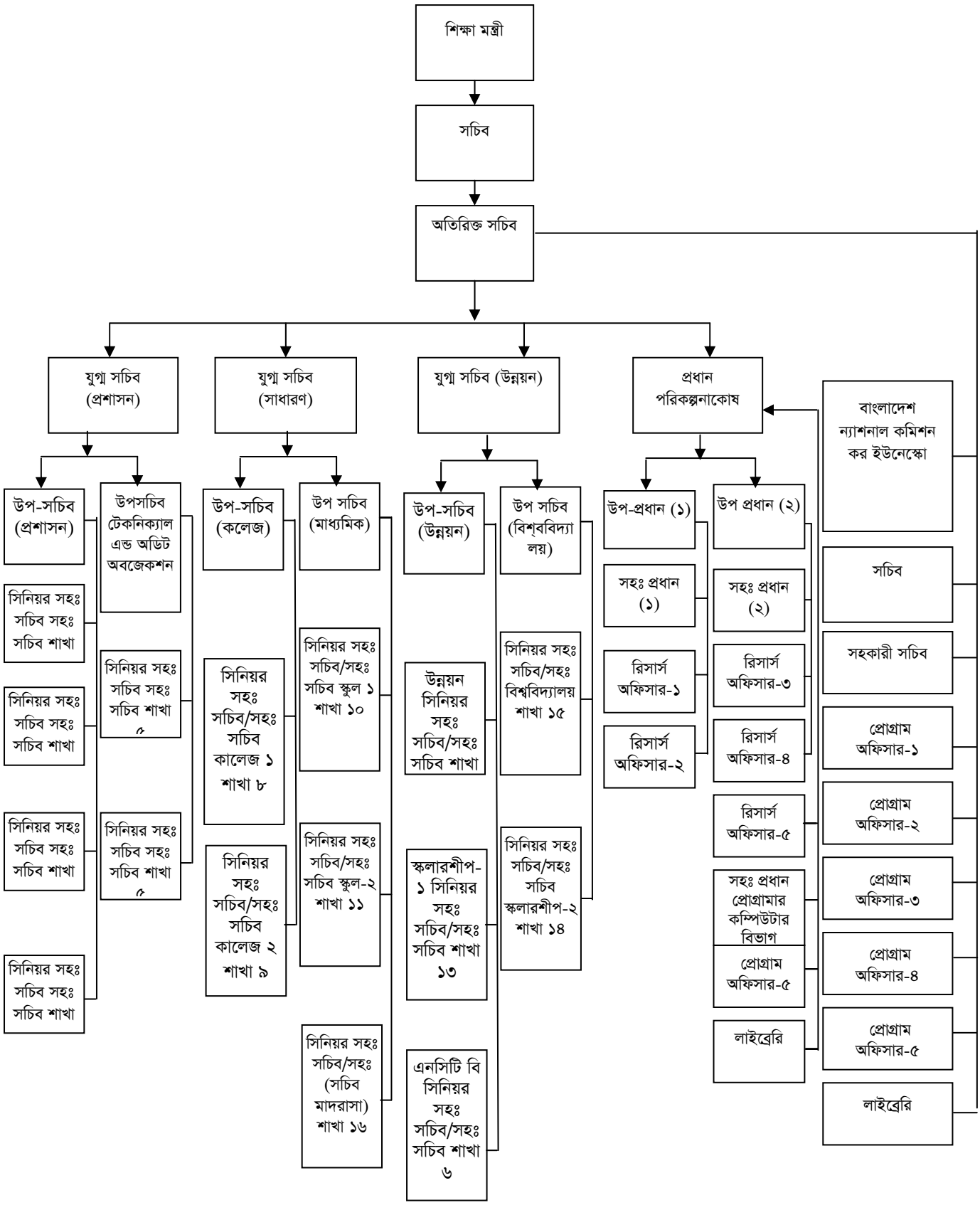

ক্ষমতা ও দায়িত্ব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক প্রশাসন ও পরিকল্পনার মৌল ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে । এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে ।

১। শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, বিধি ও প্রবিধি জারিকরণ;
২। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরীর ন্যূনতম শর্তাবলি নির্ধারণ;
৩। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স নির্ধারণ;
৪। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধি প্রণয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শকরণ;
৫। ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি বা অবসর প্রদান;
৬। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ;
৭। বেতন ভাতা প্রভৃতির স্কেল নির্ধারণ;
৮। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
৯। শিক্ষার উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কমিশন নিয়োগ;
১০। সুনির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমিত ব্যয় সাপেক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
১১। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন;
১২। অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
১৩। জাতীয় শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন এবং বিভাগ, বিভিন্ন পরিদপ্তর ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ প্রদান;
১৪। জাতীয় উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান এবং
১৫। জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ।

ওপরের আলোচনায় লক্ষণীয় যে, সকল নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গৃহীত হয় । অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যা লাইন সংস্থাসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত রূপরেখায় বাস্তবায়িত হবে তাও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়ে থাকে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন ।

১ । মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান কে?

ক) শিক্ষা মন্ত্রী
খ) সচিব
গ) অতিরিক্ত সচিব
ঘ) যুগ্মসচিব

২ । পরিকল্পনা কোষ প্রধানের পদমর্যাদা কার সমান?

ক) সচিব
খ) অতিরিক্ত সচিব
গ) যুগ্ম সচিব
ঘ) উপসচিব

৩ । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষণের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত?

ক) অতিরিক্ত সচিব
খ) যুগ্মসচিব
গ) উপসচিব
ঘ) পরিকল্পনা কোষ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষের সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন ।

২ । বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সাংগঠনিক কাঠামো ছকের সাহায্যে উল্লেখ করুন ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১ । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও সাংগাঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন ।

২ । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিবরণ দিন ।

সঠিক উত্তর

১ । খ, ২ । গ, ৩ । ঘ

পাঠ-৪.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)

[Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে পারবেন;
- অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করত পারবেন;
- অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিবৃত করতে পারবেন এবং
- আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধরন উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি)। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম সংগঠন ও অংগ অধিদপ্তর। মাউশি মূলত কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে অঞ্চল, জেলা পর্যায়ের এর প্রশাসন বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রধান ভূমিকা হল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব শিক্ষার মন্ত্রণালয়ের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মাউশি'র। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাই এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত

ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিরূপন ও বন্টন, পারস্পারিক যোগাযোগ ও দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৮৫৪ সালের উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচের সুপারিশের ভিত্তিতে জনশিক্ষা পরিচালক বা ডিপি আই অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের গোড়াপত্তন হয়। কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামলে একে পুনর্গঠিত করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্যপরিধি

অধিদপ্তরের কার্য পরিধি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার (সরকারি) সার্বিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত। বর্তমানে এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনক্রমের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করার ফলে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ, সরকারি অনুদান বন্টনসহ বিভিন্ন কাজ এ অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে এসে যায়। ফলশ্রুতিতে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দপ্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৩১৭টি সরকারি স্কুল এবং ১০, ৪৫৯টি বেসরকারি স্কুল এবং ৬,৮৩৫টি বেসরকারি ও ৩টি সরকারি মাদ্‌রাসা রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের কলেজ শিক্ষা বিভাগের আওতায় ২৩৩টি সরকারি এবং ১,৪৩৬টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় পর্যায়

অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

মাউশির নির্বাহী প্রধান হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে এই অধিদপ্তরের চারটি প্রধান শাখা রয়েছে, যেমন-(১) কলেজ ও প্রশাসন; (২) মাধ্যমিক শিক্ষা ; (৩) প্রশিক্ষণ এবং (৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন করে পরিচালক কর্তব্যরত আছেন। এছাড়া শারিরীক শিক্ষা -- নামে মাউশির আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে যার পধান হলেন একজন উপ-পরিচালক।

শারীরিক শিক্ষার উপ-পরিচালকসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাউশিতে আটজন উপ-পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এরা হলেন- ১) উপ-পরিচালক, সরকারি কলেজ; ২) উপ-পরিচালক, বেসরকারি কলেজ, ৩) উপ-পরিচালক, সাধারণ প্রশাসন; ৪) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা; (৫) উপ পরিচালক বিশেষ শিক্ষা; (৬) উপ পরিচালক, শারীরিক শিক্ষা; (৭) উপ পরিচালক, প্রশিক্ষণ এবং (৮) উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। অধিদপ্তরের পরিচালক ও উপপরিচালকদের কাজে সহায়তার জন্য রয়েছে ১৩ জন সহকারী পরিচালক, সাত জন শিক্ষা কর্মকর্তা এবং কয়েকজন গবেষণা কর্মকর্তা। এছাড়া রয়েছেন অন্যান্য কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ। অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহেও বেশ কিছু সংখ্যাক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

আঞ্চলিক পর্যায়ে

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য মাউশির নয়টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস আছে। আঞ্চলিক অফিসগুলো ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশালে অবস্থিত। নয়টি আঞ্চলিক অফিসের দায়িত্বে আছেন নয়জন আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদর্শক এবং একজন পরিদর্শিকা। তাঁদেরকে কাজে সহায়তার জন্য রয়েছেন যথাক্রমে একজন সহকারী পরিদর্শক ও একজন সহকারী পরিদর্শিকা। এছাড়া রয়েছেন অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ।

জেলা পর্যায়ে

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা পর্যায়ে রয়েছে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস। এর প্রদান হলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তাঁর অধীনে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করেন।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাঠামো

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংঠনিক কাঠামো নিম্নে অধিকতর বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখ করা হল।

১. পরিচালক : কলেজ ও প্রশাসন শাখা

ক) উপ-পরিচালক-সহকারী কলেজ

- সহকারী পরিচালক-১ কলেজ
- সহকারী পরিচালক-২ কলেজ
- শিক্ষা অফিসার-ব্যক্তিগত নথি
- শিক্ষা অফিসার (২জন) এসিআর

খ) উপ-পরিচালক-বেসরকারী কলেজ

- সহকারী পরিচালক ৩ কলেজ
- সহকারী পরিচালক ৪ কলেজ

গ) উপ-পরিচালক সাধারণ প্রশাসন

- সহকারী পরিচালক-সাধারণ প্রশাসন
- শিক্ষা অফিসার (২জন) মামলা

২. পরিচালক : মাধ্যমিক শিক্ষা শাখা

ক) উপ-পরিচালক- মাধ্যমিক শিক্ষা

- সহকারী পরিচালক-সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- ♦ সহকারী পরিচালক-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ♦ শিক্ষা অফিসার (২জন)

খ) উপ-পরিচালক-বিশেষ শিক্ষা

- ♦ সহকারী পরিচালক-বিশেষ শিক্ষা

গ) আঞ্চলিক উপ-পরিচালকবৃন্দ (নয় জন)

- ♦ বিদ্যালয় পরিদর্শক
- ♦ বিদ্যালয় পরিদর্শিকা
- ♦ সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক
- ♦ সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা

- ♦ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
- ♦ সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
- ♦ প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা

৩. পরিচালক : প্রশিক্ষণ শাখা

ক) উপ-পরিচালক-প্রশিক্ষণ

- ♦ সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ
- ♦ গবেষণা কর্মকর্তা-প্রশিক্ষণ

৪. পরিচালক : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

ক) উপ-পরিচালক-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

- ♦ সহকারী পরিচালক-পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ♦ সহকারী পরিচালক-বাস্তবায়ন
- ♦ গবেষণা কর্মকর্তা-৪জন

৫. উপ-পরিচালক : শারীরিক শিক্ষা শাখা

- ♦ সহকারী পরিচালক-পুরুষ
- ♦ সহকারী পরিচালক-মহিলা

[মাউশির সাংগঠনিক কাঠামোর ছক এই পাঠের শেষে উপস্থাপিত হল]

অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
২. দেশের সাধারণ শিক্ষা বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারি নীতি প্রণয়নে সরকারকে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা;
৪. উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;
৫. সাধারণ শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখা;
৬. অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই ও বিষয় নির্ধারণ;
৭. রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট তৈরি এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ, নিরীক্ষণ ও বরাদ্দ প্রদান করা;
৮. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অবসর, শৃঙ্খলামুলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশাসন এবং সংস্থাপনের দায়িত্ব পালন করা;
১০. অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রেরণ করা;
১১. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;
১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসূমহের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা;

১৩. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন কোর্স/বিষয় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও সুবিধাদির ব্যবস্থা করা;
১৪. অধীনস্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা ।

আঞ্চলিক পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

আঞ্চলিক পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণের জন্য রয়েছে দুই পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা । এগুলো হল-(১) আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস এবং (২) জেলা শিক্ষা অফিস । এসব অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ে পর্যন্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে । নিম্নে এদের প্রশাসনিক কাঠামো এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হল ।

আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস

প্রশাসনিক কাঠামো

পূর্বেই আমরা জেনেছি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে নয়টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস রয়েছে । প্রত্যেকটি আঞ্চলিক অফিসের প্রধান হচ্ছেন উপ-পরিচালক । আঞ্চলিক অফিসের প্রতিটিতে রয়েছেন দু'জন স্কুল পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা এবং দুজন সহকারী স্কুল পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা । এছাড়াও রয়েছেন একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও কয়েকজন কর্মচারী ।

আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসগুলো নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে:

১. মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবর্তিত সরকারি নীতিমালা আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন;
২. মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান;
৪. উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;
৫. মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. সরকারী শিক্ষকদের বদলি, পদোন্নতি, বেতন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ, অবসর, ছুটি, শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি প্রশাসনিক ও সংস্থাপনিক দায়িত্ব পালন;
৯. অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রেরণ;
১০. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সংযোগ স্থাপন;
১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয়সাধন;
১২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল ঘোষণা ও বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৩. বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাদুলার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠনে সহায়তা করা এবং
১৫. নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ।

জেলা শিক্ষা অফিস

প্রশাসনিক কাঠামো

মাধ্যমিক শিক্ষা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা শিক্ষা অফিস আছে । এ হিসাবে মাধ্যমিক জেলা শিক্ষা অফিসের সংখ্যা ৬৪টি । প্রতিটি অফিসের প্রধান হলেন একজন জেলা শিক্ষা অফিসার এবং তাঁকে সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার । এছাড়া রয়েছেন একজন হিসাব রক্ষক এবং বেশ কয়েকজন কর্মচারী । এদের সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা অফিসার মাঠ পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ পরিচালক ও তদারকী করে থাকেন । সাংগঠনিক দিক থেকে জেলা শিক্ষা অফিসগুলো আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের নিয়ন্ত্রাধীন ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশন এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদান এসব দায়িত্বের অন্যতম। নিম্নে সংক্ষেপে জেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব আলোচনা করা হল।

জেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;
২. জেলার বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতির মান পরিদর্শন।
৩. শিক্ষার উন্নয়নে প্রধান শিক্ষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
৪. শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সকল নির্দেশ বাস্তবায়ন;
৫. পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিদ্যালয়ে পাঠদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. নিম্ন-মাধ্যমিক বৃত্তি এবং বোর্ড পরীক্ষাসমূহ যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান;
৭. বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮. নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করা;
৯. বিদ্যালয়গুলোতে খেলার মানোন্নয়নে এবং পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
১০. বিদ্যালয়গুলোতে যে কোন ধরনের বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
১১. অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোপন প্রতিবেদন প্রদান।

বিদ্যালয়ের পর্যায়ে জেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব

জেলা শিক্ষা অফিসার স্থানীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর মাধ্যমে স্থানীয় স্কুলগুলো ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। স্কুলকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তাঁর মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলকে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা যেমন, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মহা পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।
- স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের বেতন বাবদ সরকারি অনুদান সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র তাঁর মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হয়।
- বিদ্যালয়ে নতুন সেকশন এবং অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের শর্তাবলি পূরণসংক্রান্ত কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসারের মতামতসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও অনুদান দেওয়া হয়।
- স্কুলের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি এবং প্রস্তাব এর কপিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে মহাপরিচালকের কাছে পাঠাতে হয়। জেলা শিক্ষা অফিসারের মতামতের ভিত্তিতেই নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়মানুগ হয় এবং প্রয়োজনীয় বেতন অনুদান (Salary Support) পাওয়া যায়।
- স্কুলের জমি, বাড়ি, ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষোপকরণ, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার তথা ভৌত ও একাডেমিক সুযোগ সুবিধার ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও তার স্থায়িত্বকাল। এ সংক্রান্ত "পরিদর্শন বিবরণী" পূরণ করে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রেরণ করতে হয়।

থানা পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রশাসনিক কাঠামো

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে থানা পর্যায়ে কোন স্থায়ী অফিস ও শিক্ষা কর্মকর্তার পদ নেই। তবে বর্তমানে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় সব থানাতেই একজন করে "থানা প্রকল্প কর্মকর্তা"-রয়েছেন। বর্তমানে এই কর্মকর্তাগণ চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাজ করছেন। ধারণা করা হয় এ পদগুলো পরবর্তীকালে রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এরাই মাধ্যমিক থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

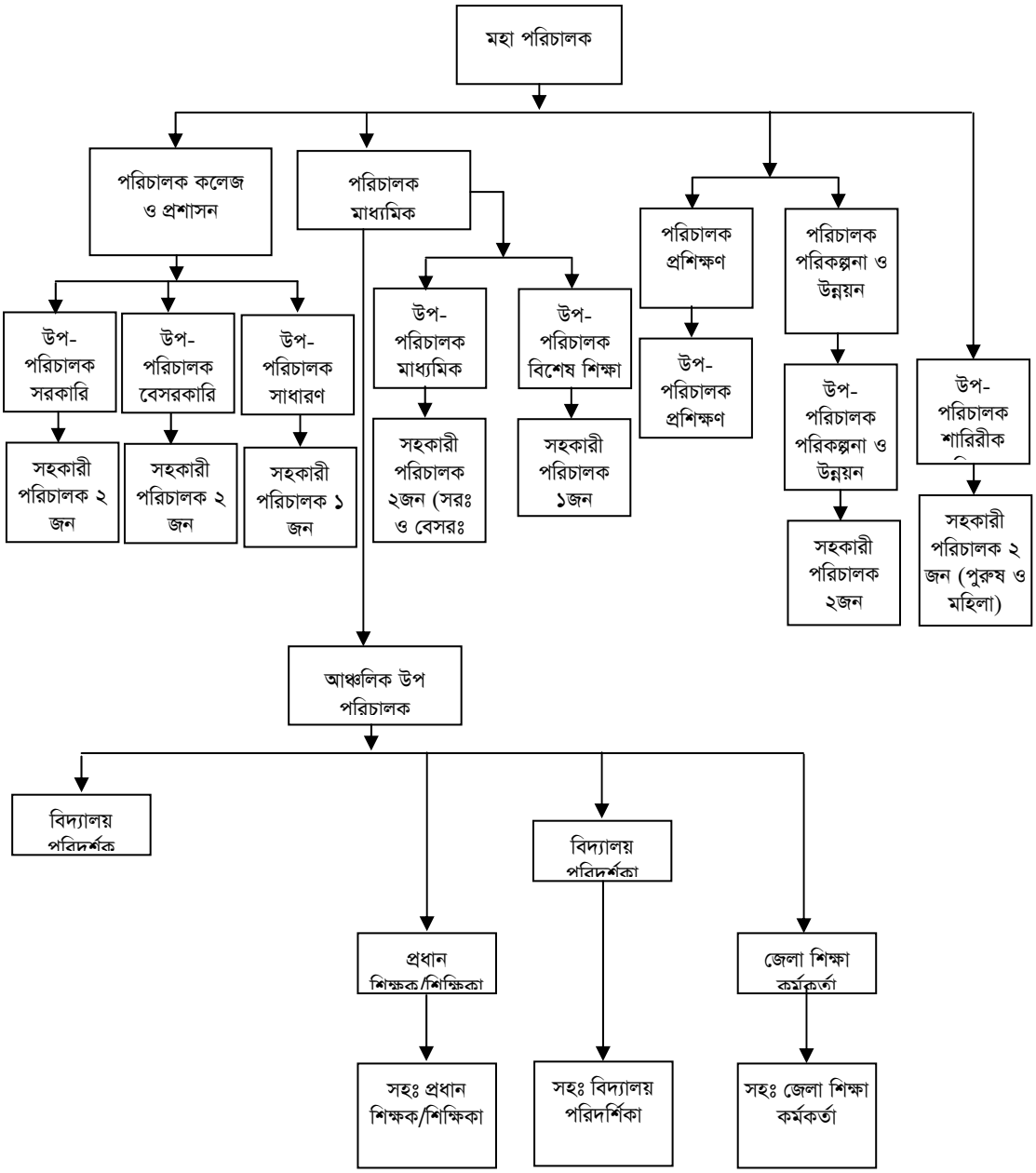

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামোতে মহাপরিচালকের পরে কে রয়েছেন?
   ক) সহকারী পরিচালক
   খ) পরিচালক
   গ) উপ-পরিচালক
   ঘ) শিক্ষা অফিসার

২. শিক্ষকদের নিয়োগ, অবসর প্রদান, ছুটি, শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কার?
   ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ) অধিদপ্তর
   গ) আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস
   ঘ) জেলা শিক্ষা অফিস

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।
৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্য পরিধি বর্ণনা করুন।
৪। আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের পাঁচটি দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।
৫। জেলা শিক্ষা অফিসের প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো এবং কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
২। আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখপূর্বক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।
৩। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জেলা শিক্ষা অফিস কী দায়িত্ব পালন করে?
৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়?

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। গ।

পাঠ-৪.৪

মাউশি-র মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা

[Roles, Responsibilities and Power of Director General, Directors and others of DSHE]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► মাউশির মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► পরিচালক-কলেজ ও প্রশাসন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষমতা এবং কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন;
- ► পরিচালক প্রশিক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত করতে পারবেন;
- ► কলেজের অধ্যক্ষের ক্ষমতা এবং কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ► প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষমতা এবং কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন ।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অধিদপ্তরের ও অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রীক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন;
২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে টেকনিক্যাল বিষয়ে এবং অধিদপ্তর সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে উপদেশ প্রদান;
৩. নির্ধারিত বাজেটের আওতায় অধিদপ্তরের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪. বিভিন্ন এ্যাকট, অর্ডিন্যান্স, নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন;
৫. দপ্তরের যথাযথ পরিচালন এবং শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকা;
৬. অধীনস্ত গেজেটভুক্ত সকল কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুত;
৭. মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তার ও কর্মচারীদের নির্বাহী এবং কার্যকরী নিদের্শনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন;
৮. অধিদপ্তরের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ;
৯. অধীনস্ত কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদানের সুস্পষ্ট নির্দেশ (Standing) জারিকরণ;
১০. দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা এবং যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন;
১১. দপ্তরের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ;
১২. সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি অনুমোদন এবং
১৩. কর্মধীন অফিসে অধীনস্ত সকল কর্মকর্তার সাথে মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমিমাংসিত কাজসমূহ এক মাসের মধ্যে সম্পন্নকরনের ব্যবস্থাকরণ ।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পরিচালক কলেজ ও প্রশাসনের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

১. সরকারি কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্তঃকলেজ বদলি করা;
২. সরকারি কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক সংস্থাপনিক দায়িত্ব পালন;
৩. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন;
৪. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জেনারেল প্রভিডেন্ড ফান্ড অনুমোদন;
৫. সহযোগী অধ্যাপক পদের নিচের কর্মকর্তাদের বদলিকরণ;

৬. কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রদান;
৭. বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকার প্রদত্ত বেতন ও অনুদান সংক্রান্ত কেইজ নিষ্পত্তিকরণ;
৮. দেশের ভিতরে চাকুরীর প্রয়োজনে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের আবেদন পত্র অগ্রায়ন;
৯. বেসরকারি কলেজের গভনিং বডির জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন;
১০. অধীনস্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা;
১১. অধ্যক্ষ এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করা;
১২. অধিদপ্তরের সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন এবং
১৩. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. বিদ্যালয় এবং পরিদর্শন শাখার শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্ত:বিভাগীয় বদলিকরণ;
২. বিভাগীয় উপপরিচালকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুমোদন;
৩. বিদ্যালয় এবং পরিদর্শক শাখার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান;
৪. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন;
৫. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জেনারেল প্রভিডেন্ড ফান্ড অনুমোদন;
৬. বিভাগীয় উপপরিচালকের নিম্নপদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বদলি করা;
৭. সরকারি বিদ্যালয় ও মাদরাসার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান;
৮. বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে প্রদত্ত সরকারি বেতন ও অনুদান সংক্রান্ত কেইজ নিষ্পত্তি করা;
৯. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের দেশের ভিতরে চাকুরীর আবেদনপত্র অগ্রায়ন;
১০. বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন;
১১. অধীনস্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা;
১২. আঞ্চলিক উপপরিচালক এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ব্যাতীত অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বাৎসরিক গোপন প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করা এবং
১৩. মহাপরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক যে কোন দায়িত্ব পালন ।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পরিচালক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখাশুনা করা;
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন;
৩. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ-এ যোগদানের জন্য অংশগ্রহণ নির্বাচন করে মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য অনুমোদন প্রদান;
৫. অধীনস্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন;
৬. সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা;
৭. অধীনস্ত অফিসারদের কর্মবন্টন এবং
৮. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা ।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;
২. উন্নয়ন প্রকল্প সম্বন্ধীয় তথ্য বিবরণী পরিকল্পনা কোষ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;
৩. পরিকল্পনা শাখার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন করা;

৪. অধীনস্ত সহকারী পরিচালকদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা;
৫. অধীনস্তদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা এবং
৬. মহাপরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন;

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

কলেজের অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. অনুমোদিত পোস্ট এবং প্রদত্ত ফান্ডের ভিত্তিতে সরকারি কলেজসমূহে এম এল এস এস নিয়োগ;
২. নির্ধারিত এ্যাক্ট, অর্ডিন্যান্স, নিয়ম ও প্রবিধান এবং সরকারি/মহাপরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক কলেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৩. শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্বাহী ও কার্যকরী নির্দেশনা প্রদান;
৪. অধীনস্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান;
৫. সরকারি সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং যেখানে প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়;
৬. বিধি অনুযায়ী সরকারি অর্থ উত্তোলন ও খরচ;
৭. গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রদান এবং
৮. অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন ।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. এ্যাক্ট, অর্ডিন্যান্স নিয়ম ও প্রবিধান এবং সরকারি/মহাপরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন;
২. শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও কার্যকরী নিদের্শনা প্রদান;
৩. বিদ্যালয়ের অধীনস্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন;
৪. সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে রাজস্ব সংগ্রহ;
৫. নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে সরকারি অর্থ উত্তোলন ও খরচ;
৬. অধীনস্তদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা এবং
৭. ট্যুর/ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধীনস্তদের নিয়ন্ত্রণাকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. উন্নয়ন প্রকল্প সম্বন্ধীয় তথ্য বিবরণী পরিকল্পনা কোষে প্রেরণের দায়িত্ব কার?
   ক) পরিচালক-মাধ্যমিক শিক্ষা
   খ) পরিচালক-কলেজ
   গ) পরিচালক-প্রশিক্ষণ
   ঘ) পরিচালক-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

২. অধিদপ্তরের সকল পরিচালকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
   ক) প্রশিক্ষণ আয়োজন
   খ) অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
   গ) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি অনুমোদন
   ঘ) অধীনস্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লেখা ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । মহাপরিচালকের পাঁচটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করুন ।
২ । পরিচালক প্রশিক্ষণ এবং পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন ।
৩ । মহাপরিচালক কর্তৃক মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?
৪ । কর্মচারী নিয়োগদানের ক্ষেত্রে কলেজ অধ্যক্ষের ক্ষমতা কী?
৫ । সকল পরিচালকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এমন তিনটি কাজ উল্লেখ করুন ।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । পরিচালক কলেজ ও প্রশাসন এবং পরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষমতার তুলনামূলক বিবরণ দিন ।
২ । মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন ।

সঠিক উত্তর

১ । ঘ, ২ । ঘ

পাঠ-৪.৫ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
[National Curriculum and Texbook Board (NCTB)]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি-র ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এনসিটিবি-র প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখ করতে পারবেন;
- এনসিটিবির কার্যাবলি বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি-র উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যই হল শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান। শিক্ষার পরিকল্পনা সুপরিকল্পিত এবং সুষ্ঠু না হলে যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ নয়। সেকারণে যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করার পূর্বেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, কি পাঠদান করতে হবে, কাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি বিষয়বস্তু এবং কোন কলাকৌশল ও শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনা করে নিতে হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত এরকম একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যে সংস্থা পালন করে সেটি হল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, সংক্ষেপে এনসিটিবি। এটি মূলত একটি পেশাগত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কাজ হল প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা। সেই সাথে প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, অনুমোদন ও বিতরণের দায়িত্বও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পালন করে। ১৯৮৩ সনের ২রা অক্টোবর তৎকালীন বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড (BSTB) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (NCDC) একীভূত হয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠিত হয়।

প্রশাসনিক কাঠামো

এনসিটিবি-র প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন চেয়ারম্যান। বোর্ডের রয়েছে তিনটি প্রধান শাখা-শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং অর্থ। প্রতিটি শাখার প্রধান হলেন একজন সদস্য। এছাড়া বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড দেখাশুনার জন্য রয়েছে প্রশাসনিক শাখা যার প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন সচিব।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূল দায়িত্ব শিক্ষাক্রম শাখার। সাতটি উপ-শাখার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালিত হয়। উপশাখাগুলো হল- (১) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা; (২) মাধ্যমিক শিক্ষা; (৩) মাদ্‌রাসা শিক্ষা; (৪) প্রাথমিক শিক্ষা; (৫) কারিগরি শিক্ষা; (৬) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা এবং (৭) গ্রন্থাগার শাখা। গ্রন্থাগার ব্যতীত প্রতিটি উপশাখায় কয়েকজন ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় পর্যায়ে সমাদৃত শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত দলে নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদনাপূর্বক মুদ্রণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করে পাঠ্যপুস্তক শাখা। অর্থ শাখা বোর্ডের সার্বিক আর্থিক দায়

দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হল।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

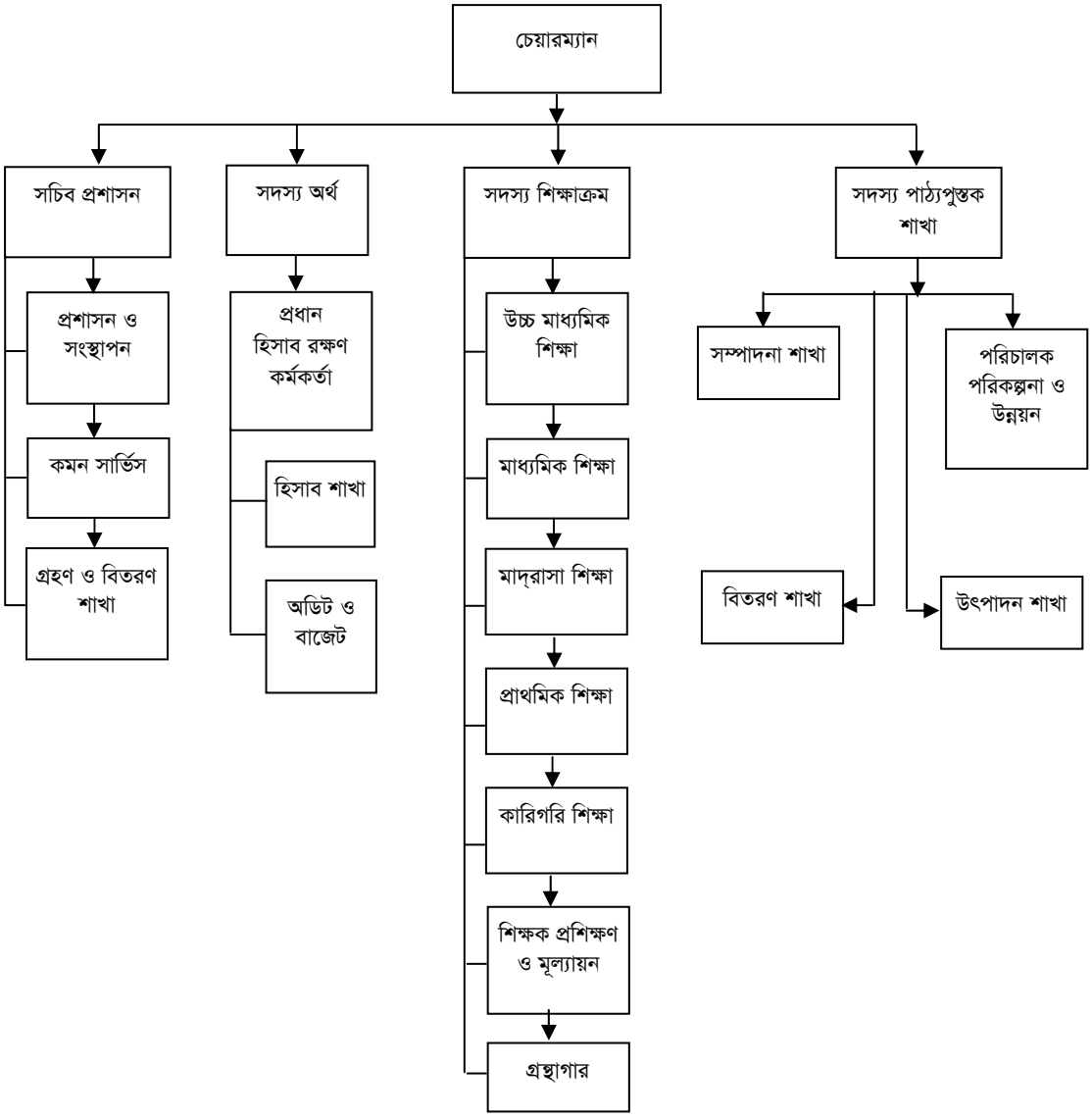

এনসিটিবি-র কার্যাবলি

এনসিটিবি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অত্যান্ত দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরকে ও শ্রেণীর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, নবায়ন ও পরিমার্জন;

১। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তর ও শ্রেণীর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, নবায়ন ও পরিমার্জন;

২। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রমও পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা সম্পর্কে ট্রাই অডিট (প্রাকপরীক্ষা) এবং মূল্যায়ন;

৪। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবই সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশনা, অনুমোদন, বিতরণ এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫। প্রাইজ ও লাইব্রেরি বই ও সহায়ক গ্রন্থের অনুমোদন দান;

৬। বিজ্ঞান বিষয়ক এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করার জন্য অনুদান প্রদান;

৭। বিনামূল্যে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রদান;

৮। পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম আয়োজন;

৯। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক এবং সম্পূরক শিক্ষোপকরণ, যেমন শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রাশ্ন পুস্তিকা ইত্যাদি প্রণয়ন;

১০। শিক্ষাক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা এবং

১১। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি-র উল্লেখযোগ্য অবদান

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যুগ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের পরিবর্তনশীল আর্থ সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক চেতনা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে এর পরিমার্জন ও নবায়ন অপরিহার্য। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে সমকালীনতা প্রদানের লক্ষ্যে এনসিটিবি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। নিচে এনসিটিবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম আলোচনা করা হল।

যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

১। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনসিটিবি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর আওতায় ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়।

পাঠ্যপুস্তক থেকে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ

২। এনসিটিবি বোর্ডের শিক্ষাক্রম শাখায় "উন্নয়নে নারী" ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থেকে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যে মহিলাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা বানানের ক্ষমতা নির্ধারণ

৩। এনসিটিবি গবেষনালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পাঠ্যবইয়ের অনুসরণের জন্য বাক্য কাঠামো নীতি নির্ধারণ করেছে। এছাড়া সহজ ও অভিন্ন বানানরীতি প্রবর্তনের

মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বানানে সমতাবিধান করা হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

৪। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নবায়ন ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি শ্রেণীকরণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যমূখী এবং শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমার্জন

৫। শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক তুল্যমানে উন্নীতকরণ; আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে তা চালু করা হয়েছে।

জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন

৬। দেশের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যার সামধানের শিক্ষর্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে এনসিটিবিতে "জনসংখ্যা শিক্ষা" প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তর, মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং কারিগরি শিক্ষায় জনসংখ্যা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ ও গৃহীত হয়েছে।

কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন

৭। শিক্ষার্থীদের স্বকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ এবং দেশের কৃষির উন্নয়নে সহায়ক জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে কৃষি শিক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস

৮। শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং ক্রমধারা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রতিফলিত করা হয়েছে।

ইংরেজিতে মুদ্রিত পাঠ্যপ্রস্তক

৯। দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিকভাবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। ফলে কোন কোন স্কুলে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছানুযায়ী একই সিলেবাসে বাংলা বা ইংরেজি যে কোন মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

Communicative English এর উপর গুরুত্বারোপ

১০। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (English Language Teaching Imporvement Project ELTIP) গ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদের Communicative English Language শিখন শেখানোর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হয়েছে।

সাম্রতিক সমস্যা

১১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইডস ইত্যাদি সাম্প্রতিককালের সমস্যাগুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এগুলো প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

১২। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে।

- মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন
- মাধ্যমিক স্তরে পৃথক শাখা হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষা চালুকরণ এবং
- আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে Entrepreneurship education প্রবর্তন।

এভাবে এনসিটিবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের অব্যাহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তথা শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শ্রেণীকক্ষে এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কর্মদক্ষতার ওপর। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। এনসিটিবি-র অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল-
   ক) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বিস্তরণ
   খ) বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
   গ) শিক্ষকদের চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান
   ঘ) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান।

২। পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনার কাজটি এনসিটিবি-র কোন শাখার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত?
   ক) শিক্ষাক্রম
   খ) হিসাব
   গ) প্রশাসন
   ঘ) পাঠ্যপুস্তক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি কী ভূমিকা পালন করে?
২। এনসিটিবি-র প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।
৩। ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এনসিটিবি-র ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রমের আওতায় এনসিটিবি-র উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডগুলো কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি-র কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
২। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবির উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো লিখুন।
৩। এনসিটিবির প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। ঘ

পাঠ-৪.৬ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

[Secondary and Higher Secondary Education Board]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা বোর্ডের গঠন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন;
- বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নির্দেশ করতে পারবেন;
- বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে বিবৃত করতে পারবেন এবং
- বোর্ডের শাখাওয়ারী কার্যক্রম উল্লেখ করতে পারবেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে তৎকালীন ঢাকা শহরের মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা এবং অবিভক্ত বাংলা ও আসামের হাই মাদ্‌রাসার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে "ইস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড" করা হয় এবং তৎকালীন সমগ্র পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক ও হাই মাদ্‌রাসা শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে একটি এ্যাকট এর মাধ্যমে পুনরায় এর নাম পরিবর্তন করে "ইস্ট পাকিস্তান সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড" করা হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আলাদা করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে বোর্ডের নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯৬২ সালে "মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা" নামকরন করা হয় এবং দেশের একাধিক সমমানের শিক্ষা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ১৯৬২ সালে রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোরে, ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামে এবং ১৯৯৯ সালে বরিশালে ও সিলেটে নতুন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশে মোট সাতটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ক্রিয়াশীল রয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডের গঠন পদ্ধতি

শিক্ষা বোর্ড একজন চেয়ারম্যানসহ বারজন সদস্য নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বোর্ড গঠন করে। বোর্ডের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ।

গঠন কাঠামো

১। চেয়ারম্যান

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বা তাঁর মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর;

৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বা তাঁর মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর;

৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর মনোনীত অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা যিনি কমপক্ষে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত রয়েছেন;

৫। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচারক বা তাঁর মনোনীত একজন কর্মকর্তা যার পদমর্যাদা সহকারী পরিচালক পদের নিম্নে হবে না;

৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত ছেলে ও মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের একজন অধ্যক্ষ;

৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ছেলেদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা;

৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা;

৯। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত ডিগ্রি কলেজের একজন অধ্যক্ষ;

১০। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং

১১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং

১২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন পরিদর্শন কর্মকর্তা।

এই গঠন কাঠামো সকল বোর্ডের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। মনোনীত সদস্যবৃন্দ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত বোর্ডের সদস্যরূপে বিবেচিত হবেন। তবে সদস্যবৃন্দ লিখিতভাবে পদত্যাগের জন্য আবেদন করতে পারেন। সাধারণভাবে চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের মেয়াদ তিন বছর। তবে তাঁরা পুনর্বার নিযুক্ত হতে পারবেন।

বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ

সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

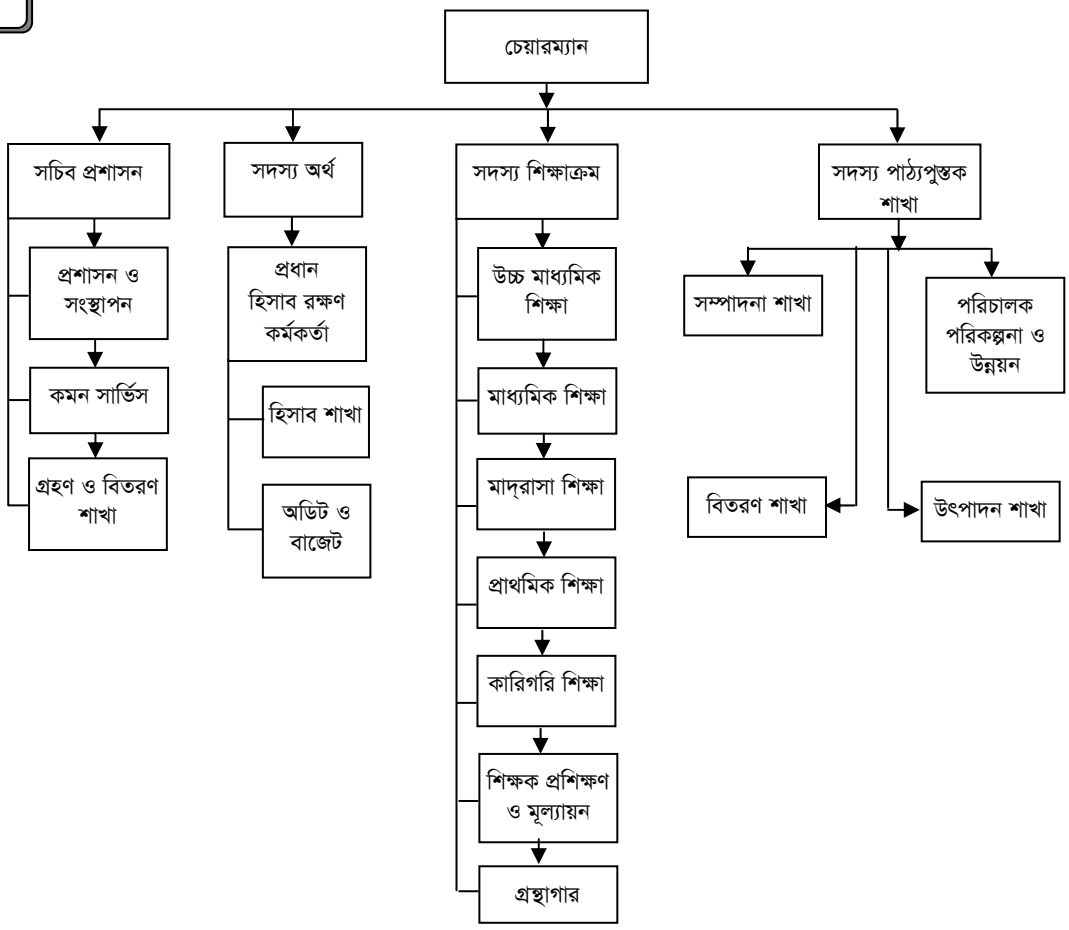

প্রশাসনিক কাঠামো

বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোর ছকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বোর্ডের প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। তাঁর অধীনে রয়েছেন কলেজ পরিদর্শক, সেক্রেটারী এবং কন্ট্রোলার। এদের প্রত্যেকের অধীনেই রয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা বোর্ডের সাংগাঠনিক কাঠামোয় নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকেন। তবে বোর্ডের এই প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনীয়, বিশেষভাবে নিম্ন পর্যায়ে। কারণ বোর্ড স্বয়ং তার কাজের প্রয়োজনে চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী ও কন্ট্রোলারের পদ ছাড়া অন্যান্য পদ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বিভিন্ন বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামোতে নিচের স্তরে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

বোর্ডের দায়িত্ব

শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নিজেই এর নির্বাহী সংস্থা। ১৯৬১ সালের অর্ডিনেন্সে এর ধারা অনুযায়ী বোর্ডসমূহের মূল দায়িত্ব হল নিজ নিজ এলাকার মাধ্যমিক ও

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিচালনা এবং উন্নয়ন করা ।

বোর্ডের কার্যক্রম

১। নতুন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন করা;

২। ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও বিদ্যালয়/কলেজ পরিবর্তনের জন্য নীতিমালা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী অনুমতি প্রদান করা;

৩। বিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শনের নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পরিদর্শন করা, প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রমিক দুর্বলতা শনাক্তকরণ ও প্রতিকারের প্রস্তাব করা;

৫। নবম ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে নিবন্ধীকরণ;

৬। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ এসসি) পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করা ;

৭। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র, সনদপত্র, সাময়িক সনদপত্র ইত্যাদি প্রদান করা;

৮। শিক্ষক এবং স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটি/গর্ভনিং বডির মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ দেখা দিলে তার মধ্যস্থতা করা অথবা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা;

৯। বিদেশ ফেরৎ বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের এবং বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের বাংলাদেশে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ালেখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

১০। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সাথে বিশ্বের অন্যান্য বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পরীক্ষার সমতুল্যতা নির্ধারণ;

১১। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলে ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান;

১২। খেলাধুলা, স্কাউটিং ইত্যাদি সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

১৩। বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা এবং

১৪। অন্যান্য প্রশাসনিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড মোটামুটি উপরিল্লিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করে থাকে । তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে সরকারি নির্দেশবলে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দেশের বিভিন্ন সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট এবং একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং তার ফল প্রকাশ এবং নম্বরপত্র ও সনদপত্র প্রদান করতে হয় ।

বোর্ডসমূহের শাখাওয়ারী কার্যক্রম

প্রশাসনিক ও সংস্থাপন শাখা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বোর্ডসমূহের কার্যক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দাযিত্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখার ওপর অর্পিত হয়েছে । নিম্নে বোর্ডের শাখাওয়ারী দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল ।

বিদ্যালয় শাখা

দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও সংস্থাপন সম্বন্ধীয় বিষয় তত্ত্বাবধান, যানহবাহন নিয়ন্ত্রন, বৃত্তি প্রদান, মুদ্রণ, সাধারন ইস্যু, সভা আহবান ইত্যাদি দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে । তবে ঢাকা ছাড়া অন্য বোর্ডের নিজস্ব মুদ্রণ ব্যবস্থা নেই ।

কলেজ শাখা

নুতন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন; ছাত্র ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধনকরণ; বিদ্যালয় পরিদর্শন; স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন এবং ছাত্র ছাত্রীদের নাম ও বয়স সংশোধনের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি ।

পরীক্ষা শাখা

নতুন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রদান; স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও স্বীকৃতি নবায়ন; ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধনকরণ; কলেজ পরিদর্শন; নির্বাহী কমিটি/গভর্নিং বডি অনুমোদন ও বাতিলকরণ ।

পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনা; ফল প্রকাশ; নম্বরপত্র ও সনদপত্র বিতরণ সাময়িক সনদ, দ্বিনকল, দিনকল সনদ ও নম্বরপত্র ইস্যু; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনসহ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ, বিদেশীয় ও দেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান; সমতুল্যতা নির্ধারণসহ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বিতরণ; রিপোর্ট প্রণয়ন; পাঠাগারের তত্ত্বাবধান ।

হিসাব শাখা

অর্থ সংগ্রহ ও বিল পরিশোধ; অডিটের ব্যবস্থা করা; হিসাবপত্র সংরক্ষণ; বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা করা ।

কম্পিউটার শাখা

এসএসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষার নম্বর প্রক্রিয়াকরণ, স্ক্যান, সম্পাদনা ও টেবুলেশনসহ পরীক্ষার ফল তৈরিকরণ, এস আই এফ/আর আই এফ ফরম সংগ্রহকরণ ও নবম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড মুদ্রণ; উভয় পরীক্ষার প্রবেশপত্র মুদ্রণ, টেবুলেশন শীট ও নম্বরপত্র মুদ্রণ ।

কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল

এটি কেবলমাত্র ঢাকা বোর্ডে রয়েছে । এই সেলের দায়িত্ব হল কমার্শিয়াল ইনস্টিটিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের নাম নিবন্ধীকরণ; ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষা পরিচালনা; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন, প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ; ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ, নম্বরপত্র ও সনদপত্র ইস্যু করা ।

বোর্ডের অন্যান্য কর্মকাণ্ড

বোর্ডসমূহ নিয়মিত কর্মকাণ্ডের বাইরে প্রতিবছর বেশ কিছু একাডেমিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে । পরীক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সভা, আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের প্রচেষ্টা ইত্যাদি এসকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ।

উপরোল্লিখিত ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১ । শিক্ষাবোর্ডসমূহের একটি অন্যতম দায়িত্ব হল-

ক) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান
খ) ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা গ্রহণ
গ) ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষার সনদপত্র প্রদান
ঘ) অষ্টম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজন ।

২ । দেশী ও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সমতুল্যতা নির্ধারণ কোন শাখার কাজ?

ক) প্রশাসনিক ও সংস্থাপন শাখা

খ) কম্পিউটার শাখা
গ) বিদ্যালয় ও কলেজ শাখা
ঘ) পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন ।

২ । শিক্ষা বোর্ডের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করুন ।

৩ । বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামোয় কলেজ পরিদর্শকের অধীনে কারা রয়েছেন?

৪ । ১৯৬১-এর অর্ডিনেন্স অনুযায়ী বোর্ডের মূল দায়িত্ব কী?

৫ । ঢাকা বোর্ডের কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল কী দায়িত্ব পালন করে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । শিক্ষাবোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করুন ।

২ । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম বর্ণনা করুন ।

৩ । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহের শাখাওয়ারী কার্যক্রম উল্লেখ করুন ।

সঠিক উত্তর

১ । ক, ২ । ঘ ।

পাঠ-৪.৭ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

[Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংক্ষেপে ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- ব্যানবেইজ-এর প্রশাসনিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন;
- ব্যানবেইজ-এর শিক্ষা তথ্যের উৎস ও ধরন উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যানবেইজ এর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন ।

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার স্বার্থে শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রকাশনা, অর্থাৎ তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়নের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার বিধায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, বিন্যাস, অবস্থা, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক বিবরণ, ইতিহাস, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । এছাড়া জ্ঞানের বিস্তরণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা তথ্যের অবাধ প্রবাহ । বর্তমানকালে তথ্য প্রযুক্তি একটি দেশের জীবনমান উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রবাহকে গতিময়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করে থাকে ।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সংক্ষেপে বলে ব্যানবেইজ । ১৯৭৭ সনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যাপকহারে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার ফলে শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড অনেক গুণ বেড়ে যায় । এছাড়া সকালের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পরিপূরণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে । ফলে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, সংকলন এবং দেশ বিদেশের এতদসংক্রান্ত গ্রন্থ, রিপোর্ট, বিশেষ প্রকাশনা প্রভৃতির ডকুমেন্টেশন তথা জাতীয় শিক্ষা তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় । এ দপ্তরটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে ডিপিআই অফিস শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করত ।

প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কাঠামো

সৃষ্টি লগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং দপ্তর প্রধানকে হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে । দপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে একজন পরিচালক নিয়োজিত আছেন । দপ্তরের কার্যক্রম দুটি বিভাগ এবং একটি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো হল-(১) ডকুমেন্টেশন, লাইব্রেরি ও পাবলিকেশন বিভাগ (২) পরিসংখ্যান বিভাগ এবং প্রশাসন অনুবিভাগ ।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যানের উৎস

তথ্য ও পরিসংখ্যানের উৎস

ব্যানবেইস যে সব উৎস থেকে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তা হল:

১। জাতীয় শিক্ষা জরিপের মাধ্যমে;

২। সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন তথ্যসূত্রের (বিবিএসসহ) মাধ্যমে;

৩। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ভাণ্ডার থেকে এবং

৪। বিভিন্ন অধিদপ্তর, কোষ ও একাডেমী থেকে।

শিক্ষা তথ্যের ধরণ

ব্যানবেইস কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষাতথ্য ও পসিংখ্যান

ব্যানবেইস নিম্নলিখিত শিক্ষার ধারার তথ্য ও পরিসংখ্যান "বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান" শীর্ষক তথ্যপঞ্জির মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।

১। প্রাথমিক শিক্ষা	৮। কৃষি ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষা
২। মাধ্যমিক শিক্ষা	৯। শিক্ষক প্রশিক্ষণ
৩। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	১০। বিশেষ শিক্ষা
৪। মাদ্‌রাসা শিক্ষা	১১। আউটপুট পরিসংখ্যান
৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১২। শিক্ষা বাজেট ও ব্যয়ন
৬। কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা	১৩। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার অবস্থান
৭। চিকিৎসা শিক্ষা	১৪। বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্যের সাথে অন্যান্য দেশের শিক্ষা তথ্যের তুলনামূলক চিত্র।

ব্যানবেইসের কার্যাবলি

ব্যানবেইসের কার্যাবলী

ব্যানবেইজ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষা তথ্য ভাণ্ডার বিনির্মাণ, শিক্ষা তথ্য সরবরাহ ও শিক্ষা তথ্যের প্রবাহের দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে ব্যানবেইস-এর কাজগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। জাতীয় পর্যায়ে যাবতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, বিন্যাস ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং দেশ-বিদেশের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা;

২। জাতীয় শিক্ষা তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা;

৩। শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করা;

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, পাঠদান অবস্থা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রণয়ন;

৬। শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ এতদসংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন, শিক্ষা সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনা;

৭। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী ও তথ্যাদির আদান-প্রদান;

৮। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার দেশী-বিদেশী পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী, বিশ্বকোষ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার পরিচালনা;

৯। শিক্ষা গবেষণা কাজে সহায়তা দান;

১০। ইউনেস্কো, ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব এডুকেশন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি আহরণ এবং জিজ্ঞাস্য প্রশ্নমালা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তথ্য পরিবেশন;

১১। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক অনুদান হিসেবে দেয় অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে এমপিও (Monthly pay order) প্রণয়ন।

১২। সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন/অভিযোগ/সংবাদ এর ক্লিপিং সংকলন করে নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।

১৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতাপুষ্ট সংস্থা RINSCA (Regional Informatics Network for South and Central Asia)-এর ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা।

১৪। গ্রামে অবস্থিত সকল সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও অনুমোদিত বেসরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত মেয়ে শিক্ষার্থীদের গ্রান্ট-ইন-এইড এবং সম্পূরক অর্থ প্রদানের জন্য কম্পিউটারাইজড পেমেন্ট ভাউচার প্রস্তুতকরণ।

১৫। সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, সরকারি কলেজ এবং বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা) সামগ্রিক তথ্য সংক্রান্ত প্রোফাইল এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সামগ্রিক ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালফিলকরণ।

১৬। ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার প্রোফাইল এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কম্পিউটার ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালফিলকরণ।

১৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ও পরিসংখ্যান সার্ভিস (Educational Management and Information System-EMIS) শক্তিশালীকরণের জন্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা।

১৮। শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট, লিফলেট, ব্রুসিয়ার, টেলিফোন গাইড, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ।

পরিশেষে বলা যায় দেশ এবং বর্তমান বিশ্বের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যানবেইস বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যানবেইজের অন্যতম দায়িত্ব হল-
   ক) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
   খ) তথ্য ব্যবস্থাপনা
   গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা
   ঘ) প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

২। কোনটি ব্যানবেইজ এর কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ
   খ) শিক্ষা গবেষণা কাজে সহায়তা দান
   গ) RINSCA-র ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ কর
   ঘ) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লিখুন।

২। ব্যানবেইস-এর প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

৩। ব্যানবেইস-এর শিক্ষা তথ্যের উৎসগুলো কী?

৪। ব্যানবেইস কী কী ধরনের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রকাশ করে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যানবেইসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। এ উদ্দেশ্যে ব্যানবেইজ কী ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ঘ।

পাঠ-৪.৮

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
[National Academy for Educational Management (NAEM)]

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নায়েম-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নায়েম প্রতিষ্ঠান পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নায়েম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিবৃত করতে পারবেন;
- নায়েম-এর প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নায়েম পরিচালিত কোর্সসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন ।

ভূমিকা
নায়েম শব্দটি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে একটি পরিচিত নাম । ইংরেজিতে এর পুরো নাম হয় National Academy for Educational Management । বাংলায় একে বলা হয় নায়েম । এটি শিক্ষা মন্ত্রণায়ের একটি সংযুক্ত বিভাগ এবং পূর্ণাঙ্গ জাতীয় প্রতিষ্ঠান । শিক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি এপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ।

ঐতিহাসিক পটভূমি
প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বর্তমান নায়েমের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় তিন যুগ আগে। ১৯৫৯ সালে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কর্মসূচীকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র" । চাকুরী জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের স্বল্পকালীন ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে এর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করে ১৯৭৫ সালে এর নাম করা হয় "বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট", সংক্ষেপে একে বলা হত বিরি (BEERI) । বিরি-র অন্যতম কাজ ছিল মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম প্রণয়ন, স্বল্পমূল্যের মিডিয়া মেটেরিয়ালস প্রস্তুত, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি । আশির দশকে শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয় । ফলে শিক্ষা বিষয়ক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড রিসার্চ" (নিয়েমার) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়কে আরও উন্নতকরণের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে নিয়েমার ও বিরি একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এ্যান্ড রিসার্চ" বা নিয়েয়ার । নিয়েয়ার এর কাজ ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্‌রাসার (সরকারি ও বেসরকারি) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও প্রধানদের জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক কোর্স, শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী কোর্স, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স ইত্যাদি পরিচালনা করা । ১৯৮৯ সালে বিষয়ভিত্তিক কোর্স ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কোর্স বন্ধ করে কেবল মাত্র উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স

পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ১৯৯১ সালে এর কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করে নামকরণ করা হয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, সংক্ষেপে নায়েম। বর্তমানে এটি এক্ষেত্রে একটি এপেক্স প্রতিষ্ঠান ও ন্যাশনাল সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে কাজ করছে।

প্রশাসনিক কাঠামো

নায়েমের নির্বাহী প্রধান হলেন মহাপরিচালক। তাঁকে দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করেন চারজন পরিচালক, সাতজন উপ পরিচালক এবং ১৬জন সহকারী পরিচারক। এছাড়া রয়েছেন একজন রেজিস্ট্রার, একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনে নায়েম নিরলস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী শিক্ষা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষ জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো হল-

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

১। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের উন্নয়ন, পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন;

২। শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিতকরণে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও সভার আয়োজন।

৩। শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে স্টাডি ও গবেষনা কর্ম সম্পাদন এবং একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৪। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শিক্ষা ক্যাডারের নবীন অফিসারগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন;

৫। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার ওপর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬। বিভিন্ন স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭। শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও পরিকল্পনাবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক সেবা প্রদান এবং

৮। সমপর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আন্তঃসহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নায়েম পরিচালিত কোর্সসমূহ

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

বর্তমানে নায়েম নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেয়াদী নয়টি কোর্স পরিচালনা করছে। নিচে কোর্সগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

১। এটি নায়েম পরিচালিত কোর্সসমূহের মধ্যে অন্যতম যা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের জন্য এ কোর্সটি পরিচালিত হয়ে থাকে। পূর্বে এর মেয়াদ ছিল দুই মাস। ৫৫তম ব্যাচ থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এর মেয়াদ তিন মাস করা হয়েছে। এ কোর্সের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সম্পদসমূহ, বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ, লোক প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং ইংরেজি ও বাংলা ভাষা। পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী জ্ঞানী ও প্রশিক্ষিত কলেজ শিক্ষক তৈরি করা এর প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স (অধ্যক্ষদের জন্য)

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী কার্স (প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষেদের জন্য)

অন্যান্য কোর্স

অনিয়মিত কোর্সসমূহ

২। কোর্সটি তিন সপ্তাহব্যাপী। সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষদের জন্য এটি পরিচালিত হয়। এ কোর্সের পাঠ্যসূচি হল : ক) শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়ন; খ) শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা; গ) প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং ঘ) কর্মী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। অধ্যক্ষদের দক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তোলা এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এ কোর্সটিও তিন সপ্তাহব্যাপী। সরকারি এবং বেরসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জুনিয়র মাদ্‌রাসার তত্ত্বাবধায়কদের জন্য এটি পরিচালিত হয়। এ কোর্সের পাঠ্যসূচি অধ্যক্ষদের জন্য পরিচালিত কোর্সের অনুরূপ।

৪-৫ যে সকল প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ পূর্বে একবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য এ কোর্সটি পরিচালিত হয়। এ কোর্সটিও তিন সপ্তাহব্যাপী। সঞ্জীবনী কোর্স Advance Course হিসেবে বিবেচ্য।

৬-৯ উপরিল্লিখিত কোর্সগুলো ছাড়া নায়েম আরও চারটি কোর্স নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে থাকে এগুলো হল- ৬) গবেষণা পদ্ধতি কোর্স; ৭) শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন বিষয়ক কোস; ৮) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশিবির এবং ৯) অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স।

উপরোক্ত নিয়মিত কোর্সগুলো ছাড়াও নায়েম আরও কিছু অতিরিক্ত কোর্স পরিচালনা করে থাক যা নিম্নরূপ :

কোর্স	বিষয়বস্তু	লক্ষ্যবস্তু
১। কম্পিউটার এপ্লিকেশনস	Ms-Word, Ms-Excel, Foxpro	শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর ও দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ
২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	দুর্যোগের কারণ, প্রাক দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।	উপকূলীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ
৩। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স	বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে কর্মরত এবং প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি জ্ঞানী ও পারদর্শী না হন তবে শিক্ষার মনোন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য উপরিল্লিখিত প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে নায়েম দেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক এবং ব্যবস্থাপক গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৮

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। নায়েমের প্রধান কাজ কী?

ক) উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

খ) বিষয়ভিত্তিক কোর্স পরিচালনা

গ) থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য কোর্স পরিচালনা

ঘ) স্বল্পমূল্যের মিডিয়া মেটেরিয়ালস প্রস্তুত

২। শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের জন্য নায়েম কী কোর্স পরিচালনা করে?

ক) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স

খ) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী কোর্স

গ) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

ঘ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।

৩। নায়েমের প্রশাসনিক প্রধান কে?

ক) মহাপরিচালক

খ) চেয়ারম্যান

গ) পরিচালক

ঘ) মেম্বার।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। নায়েম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?

২। নায়েমের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

৩। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স কাদের জন্য এবং কী উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়?

৪। কলেজ ও মাদ্‌রাসা অধ্যক্ষদের জন্য নায়েম পরিচালিত কোর্সের বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নায়েমের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নায়েমের ভূমিকা কী?

২। শিক্ষা প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় নায়েম পরিচালিত কোর্সগুলোর বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। গ, ৩। ক

পাঠ-৪.৯ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো

[Bangladesh National Commission for Unesco (BNCU)]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- কমিশনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা। এ কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে ইউনেস্কোর গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচী দেশে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা করা। এটি দেশে ইউনেস্কোর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে স্বীকৃত।

পটভূমি

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে। ইউনেস্কো সংবিধানে সপ্তম অনুচ্ছেদে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে জাতীয় কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। ইউনেস্কো সংবিধানে এই ব্যবস্থানুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বি এন সি ইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশনের কার্যকলাপ পরিচালনার স্বার্থে বি এন সি ইউ এর একটি সংবিধান রয়েছে যা ১৯৮০ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী বি এন সি ইউ এর গঠন নিম্নরূপ-

গঠন পদ্ধতি

কমিশন

কমিশন ৬৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়া ইউনেস্কোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বসমূহও এই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এর সভাপতি এবং শিক্ষা সচিব কমিশনের মহাসচিব। এটি একটি নীতি নির্ধারক সংস্থা। বছরে অন্তত একবার এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি

কমিশনের একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ২২ জন। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সহ সভাপতি হলেন শিক্ষা সচিব। স্টিয়ারিং কমিটি কমিশনের Executive Body যা প্রতি তিন মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হয়। এটি কমিশনের ব্যাবস্থাপনা এবং কার্যকলাপ তদারক করে থাকে।

উপ-কমিশন

ইউনেস্কোর পাঁচটি সেক্টরের জন্য পাঁচটি উপ-কমিশন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসব উপ-কমিশন গঠিত এবং এগুলোর কাজ হল ইউনেস্কোর কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিরূপন করা।

সচিবালয়

কমিশনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য একটি সচিবালয় রয়েছে। একজন সার্বক্ষনিক সচিব যিনি উপসচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন, একজন সহকারী সচিব, পাঁচজন প্রোগ্রাম অফিসার, একজন লাইব্রেরীয়ান এবং সহায়ক কর্মচারীদের নিয়ে এই সচিবালয় গঠিত।

বি এন সি ইউ এর কর্মকাণ্ড

আমরা আগেই জেনেছি বি এন সি ইউ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর একটি বিশেষ অংগ সংগঠন। সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের পরিবারের ১৪টি বিশেষ সংস্থার মধ্যে কেবলমাত্র ইউনেস্কো বিএনসি ইউ কে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আর বি এনসি ইউ ইউনেস্কোর কর্মসূচী বাস্তাবয়নে উপদেশ প্রদানকারী, যোগাযোগ রক্ষাকারী এবং তথ্য সংগ্রহকারী Executive body হিসেবে কাজ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিএনসি ইউ এর কর্মকাণ্ড প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কোর সদর দডপ্তর এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসসমূহকে ঘিরে পরিচালিত হয়। এসব অফিসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নয়া দিল্লীস্থ Regional Office for Science and Technology for South and Central Asia (ROSTSCA), ব্যাংককে অবস্থিত Principal Regional Office for Asia and the Pacific (PROAP), যোগাযোগের জন্য কুয়ালালামপুরে অবস্থিত আঞ্চলিক অফিস এবং পুস্তকের উন্নয়নের জন্য করাচীর আঞ্চলিক অফিস। এছাড়া জাপানের টোকিওতে রয়েছে Asian Cultural Centre for Unesco (ACCU) এটি জাপান সরকারের এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, পুস্তক উন্নয়ন এবং সাহিত্য কর্মের উন্নয়নে নিয়মিত বার্ষিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচী আয়োজন করে থাকে।

প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

বিএনসি ইউ-এর প্রাথমিক দায়িত্ব হল ইউনেস্কোর বিভিন্ন অফিস ও সংস্থা এবং এদের সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসূচী বাস্তবায়নে জাতীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংশ্লিষ্ট করা। এছাড়া বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আর যেসকল কাজ সম্পাদন করে সে সম্পর্কে নিচের আলোচনা থেকে জানা যাবে।

আর্থিক সহায়তা

বিএনসিইউ বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং উন্নয়নে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ইউনেস্কোর নিকট থেকে সেগুলোর জন্য সহযোগিতা, যেমন কনসালটেন্সী, প্রযুক্তিগত সাহায্য, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি আদায় করাও এই কমিশনের কাজ।

প্রতিনিধি নির্বাচন ও মনোনয়ন

ইউনেস্কোর উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, কর্মশিবির, সমীক্ষা/গবেষণা ইত্যাদি পরিচালনায় ইউনেস্কোর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন মধ্যস্থতা করে থাকে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক কার্যাবলি, যেমন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম কর্মশিবির এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন এবং মনোনয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ইউনেস্কোর সহায়তা লাভে সাহায্যকরণ

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ইউনেস্কোর বিভিন্ন ডকুমেন্ট বিশেষত এর দ্বিবার্ষিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্থাসমূহকে অভিহিত করে। এর ফলে এসব সংস্থা ইউনেস্কোর নিয়মিত কর্মসূচীর আওতায় সহযোগিতা ও সাহায্য লাভের সুযোগ পায়। এই নিয়মিত কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি আর্থিক অনুদানসহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষ চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য লাভের সুযোগ করে দেয়। এছাড়া বিএনসিইউ ইউনেস্কোর নিয়মিত এটি ইউনেস্কোর কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী (ছয় বছরের) এবং দ্বি-বার্ষিক কনসালেটশন প্রদান করে। কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করে এবং সেগুলোর প্রসঙ্গিকতা ও উপযুক্ততা যাচাই করে জরুরি অনুমোদন লাভের জন্য ইউনেস্কোর নিকট উত্থাপন করে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত

ইউনেস্কোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, যেমন Country Paper, Working paper এবং অন্যান্য তথ্যপত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে ।

বিদেশ থেকে শিক্ষামূলক দ্রব্যাদি ক্রয়

এটি বাংলাদেশী মুদ্রায় ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর কাছে থেকে বাংলাদেশী মুদ্রার বিপরীত আমেরিকান ডলার সংগ্রহ করে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে, বিশেষত শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থাকে অন্যদেশ থেকে পুস্তক ক্রয় এবং শিক্ষামূলক/গবেষনামূলক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য দিয়ে থাকে ।

Clearing house

এটি ইউনেস্কোর সকল তথ্যাদি বিভিন্ন দেশীয় সংস্থার নিকট বিতরণের ক্ষেত্রে Clearing house হিসেবে কাজ করে ।

ডকুমেন্টেশন সেন্টার

ইউনেস্কোর সকল প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য বিএনসিইউ এর একটি পাঠাগার এবং ডকুমেন্টেশন সেন্টার আছে যা এর প্রধান অফিসে অবস্থিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৯

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১ । ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি-

ক) অংগ অধিদপ্তর
খ) সংযুক্ত দপ্তর
গ) কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সংস্থা
ঘ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

২ । ইউনেস্কোর প্রাথমিক দায়িত্ব হল-

ক) প্রকল্প উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং তদারকীকরণ
খ) ইউনেস্কোর কর্মসূচী বাস্তবায়নে জাতীয় সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট করা
গ) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ কর্মশিবির ইত্যাদি পরিচালনা
ঘ) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা ।

৩ । বিএন সি ইউ এর সচিব কার পদমর্যাদাসম্পন্ন?

ক) সচিব
খ) অতিরিক্ত সচিব
গ) উপ-সচিব
ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন ।

২ । বি এন সি ইউ এর প্রাথমিক দায়িত্ব কী?

৩ । ইউনেস্কোর সহায়তা লাভে বি এন সি ইউ এর ভুমিকা উল্লেখ করুন ।

৪ । প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিএনসি ইউ কী ভূমিকা পালন করে?

৫ । বিদেশ থেকে শিক্ষামূলক দ্রব্যাদি ক্রয়ে বি এন সি ইউ কীভাবে সহায়তা করে?

৬ । ACCU কী দায়িত্ব পালন করে ।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর গঠন পদ্ধতি আলোচনা করুন ।
২ । বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর কর্মকাণ্ড বর্ণনা করুন ।

সঠিক উত্তর

১ । গ, ২ । খ, ৩ । গ

পাঠ-৪.১০

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর
[Directorate of Audit and Inspection (DIA)]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে পারবেন;
- অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিবৃত করতে পারবেন;
- পরিদর্শন ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পরিদর্শন পদ্ধতি ও এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বস্তুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়সমূহের কার্যকারিতা ও উৎকর্ষতা বিধানের ক্ষেত্রে পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আথিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ নিয়ম ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হলে হিসাব নিরীক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণের এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণগত সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পরিসর বিরাট আকার ধারণ করেছে। ফলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারের ব্যয়ভার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকার প্রতিবছর কিছু আবর্তক মঞ্জুরিসহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতনের মেডিক্যাল ভাতা এবং ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা অনুদান হিসেবে প্রদান করছে। বেতন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিরাট অংশ সরকার কর্তৃক বহন করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এটি একটি পৃথক অধিদপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক) শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নির্দেশনা ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন এবং নিয়মিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষণে সহায়তাদানের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

গ) প্রশাসন ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত সব অনিয়ম ও অপচয় সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

গঠন

সাংগঠনিক কাঠামো

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো তুলনামূলকভাবে ছোট। এর প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন একজন পরিচালক। তাঁর অধীনে রয়েছেন একজন যুগ্ম পরিচালক এবং কয়েকজন উপ-পরিচালক। প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক ইন্সপেকশন ও অডিট টীম রয়েছে। টীমগুলো শিক্ষা পরিদর্শক, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক, অডিট অফিসার ও অডিটর সমন্বয়ে গঠিত।

দায়িত্ব ও কার্যক্রম

১. পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা;

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সরকার, বোর্ড অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহকৃত বা উপস্থাপিত তথ্য অথবা বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা;

৩. নিয়মিতভাবে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ও মহাবিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত বেতন বাবদ অনুদানের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা করা ও একাডেমিক পরিদর্শন।

৪. সরকারি অনুদান অথবা সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা যাচাই করা;

৫. স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বা অনুমতি প্রাপ্তির সময় আরোপিত শর্তাবলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূরণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করা;

৬. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরোপিত প্রশাসনিক আদেশ ও নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের বিষয়বস্তু

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের বিষয়বস্তু

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শকবৃন্দ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকেন।

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

খ) শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেসকল দিকগুলো পরিদর্শন করা হয় তা হল :

১। প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা : প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল, ভৌগোলিক পরিবেশ, জমির বিবরণ, স্থানীয় চাহিদা, সাহায্য সহযোগিতার ধরন, ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

২। গৃহ ও গৃহাঙ্গনের পরিবেশ : গৃহ সংখ্যা, অবস্থান, আয়তন, নির্মাণ বিবরণ, প্রস্রাবখানা নলকূপ, অঙ্গনের পরিবেশ, আসবাবপত্র, উপকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৩। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র পরিদর্শন।

৪। পাঠাগার : পাঠাগার অবস্থা, সংগঠন, উন্নতি সাধন, পুস্তকের শ্রেণীবিন্যাস, শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস, পুস্তক সংরক্ষণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৫। আর্থিক ও অবস্থা : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সূত্রের আয় ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক খরচের আয়, ব্যয় ও হিসাব, উন্নয়ন কর্ম এবং ভর্তি ও পরীক্ষা খাতের হিসাব নিরীক্ষণ।

৬। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিদর্শন, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ, উন্নতির ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড, পর্ব পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি পরীক্ষণ।

৭। ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রম : কমিটি নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান ও উন্নতিতে সাহায্য প্রদান।

৮। বিনোদন সংক্রান্ত : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন সময়ে বা সময়ের বাহিরে শিক্ষার্থীদের অবসর বিনোদনের কী কী ব্যবস্থা আছে তা চিহ্নিতকরণ।

অফিস পরিদর্শনের বিষয়বস্তু

অফিস পরিদর্শনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতি নজর দেওয়া হয়ঃ

১। অফিসের কর্মপদ্ধতি

২। সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

৩। অফিসের কাজের পরিবেশ

৪। নিরাপত্তা ও নিয়মানুবর্তিতা

৫। হিসাব-নিকাশ এবং

৬। চিঠিপত্র আদান-প্রদান ব্যবস্থা

নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে পরিদর্শকবৃন্দ এ ধরনের পরিদর্শন করে থাকেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরাজমান সমস্যা

১৯৮১ সালের জানুয়ারি থেকে অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের সময় কতিপয় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত অনিয়ম লক্ষ্য করা যায় যা নিম্নরূপ।

১। একই শিক্ষক কর্তৃক একই সময়ে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি অনুদান গ্রহণ;

২। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্বক্ষনিক শিক্ষক ও কর্মচারীরূপে একই সময়ে সরকারি অনুদান ও বেতনাদি গ্রহণ;

৩। ভূয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে চাকুরী গ্রহণ বা উচ্চতর বেতন গ্রহণ;

৪। সরকারি অনুদান অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ আত্মসাৎ করা;

৫। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বোর্ডের স্বীকৃতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অথবা স্বীকৃতি বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক অনিয়মিতভাবে সরকারি অনুদান উত্তোলন করা;

পরিদর্শন নিরীক্ষণে প্রাপ্ত সমস্যাবলি

৬। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় এর পরীক্ষায় অবৈধভাবে বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা;

৭। প্রয়োজনীয় পরিচালনা কমিটি গঠন না করা অথবা নিয়ম বহির্ভূভাবে গঠন করা;

৮। যথাযথ কর্তৃপক্ষ আরোপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নির্দেশাবলি লংঘন;

৯। ভূয়া শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীর নামে অনুদান উত্তোলন করা;

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান শিক্ষাদান পদ্দতি এবং মানের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা;

১১। নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ না করা;

১২। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ওপর গুরুত্বারোপ না করা;

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে উপরিল্লিখিত সমস্যাগুলো দূরীভূত করা অপরিহার্য।

অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন

হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির নির্দেশিকা

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরাজমান আর্থিক অনিয়ম দূরীকরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে একটি অভিন্ন হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ফলে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হয়। এ নির্দেশিকায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম বাস্তবায়নসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিবিধ রেজিস্টার বই অবশ্যই ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ফলে বর্তমানে সকল বেরসকারি প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষণ ক্ষেত্রে অভিন্ন নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে যা বিদ্যালয়ের আর্থিক সুব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ব্যবহৃত অভিন্ন রেজিস্ট্রারগুলো হল-

রেজিস্ট্রার সমূহ

১। সাধারণ ক্যাশ বই : এতে দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাব ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত হয়।

২। সাবসিডিয়ারী তহবিল রেজিস্টার : ভবিষ্যত তহবিল ব্যতীত অন্যান্য সাবসিডিয়ারী তহবিল (ক্রিড়া, টিফিন, লাইব্রেরী ইত্যাদি) সম্পর্কিত হিসাব এতে সংরক্ষিত হয়।

৩। স্টক রেজিস্টার : আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য পৃথক স্টক রেজিস্টার রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। ভর্তি বই : নির্ধারিত ছকওয়ারী এই রেজিস্টারে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হয়।

এছাড়া আরও রয়েছে শিক্ষক ও কর্মচারীদের হাজিরা খাতা, ছুটির রেজিস্টার, ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা, বেতন প্রদান বই, ছাত্র বৃত্তি প্রদান বই, ছাত্র বেতন আদায় বই, নোটিশ বই, রেজুলিশন বই ইত্যাদি। নির্দেশিকার একটি প্রধান নির্দেশ হচ্ছে যে দিনের কাজ সে দিনেই শেষ করতে হবে। আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখা যাবে না।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্ব অধিকতর নিষ্ঠা এবং গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করতে হবে। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সমুন্নত করতে হলে অধিদপ্তরের একাডেমিক পরিদর্শন জোরদারকরণ অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১০

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল-
- ক) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন
- খ) বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন
- গ) শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান
- ঘ) ম্যানেজিং কমিটি গঠনে সহায়তাকরণ

২। পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হলেন?
- ক) চেয়ারম্যান
- খ) পরিচালক
- গ) মহাপরিচালক
- ঘ) অর্থ উপদেষ্টা

৩। কোনটি অধিদপ্তরের কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়?
- ক) অনুদানের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- খ) শিক্ষার মানোন্নয়নে উপদেশ প্রদান
- গ) শিক্ষকদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা যাচাই
- ঘ) বিদ্যালয়ে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।

খ) অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন

গ) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

ঘ) অধিদপ্তরের পাঁচটি প্রধান দায়িত্ব ও কার্যক্রম উল্লেখ করুন।

ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক অফিস পরিদর্শনের বিষয়গুলো কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

ক) পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

খ) অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত সমস্যাগুলো কী? এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কয়েকটি সুপারিশ উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠ-৪.১১ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

[Management of Secondary Teachers' Training Programme]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের অনেকেই জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়। সে কারণে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণতকরণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি শিক্ষক সমাজ। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এবং ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না, যদি না শিক্ষকদের যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকে। তাঁদের পেশাগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। তাই বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও বেসরকারি) গড়ে উঠেছে। নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

বিএড এমএড ও সম্মান কোর্স

বর্তমানে দেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরির জন্য ১৪টি সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে। মহাবিদ্যালয়গুলো ১ বছর মেয়াদী বি এড প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রি প্রদান করে। এতে চাকুরীকালীন ও চাকুরীপূর্ব উভয় প্রকার শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। তবে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোতে চাকুরীরত প্রার্থীদের অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানে কোন কোন মহাবিদ্যালয় সম্মান কোর্স চালু করেছে। সমকালীন বিশ্বের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সাধারণ শিক্ষা ধারার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই ই আর) একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। এখানে পূর্বে এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন এবং এম এড কোর্স (নিয়মিত ও খন্ডকালীন) চালু ছিল। বর্তমানে এই গতানুগতিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামোর সংস্কার করে চার বছর মেয়াদী সম্মান ও এক

বছর মেয়াদের এম এড কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া খণ্ডকালনি শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে এম এড কোর্স চালু রয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সম্পূরক হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দূর শিক্ষণ পদ্ধতির বি এড কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য রয়েছে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন বা সি এড কোর্স। শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে একই স্কুলের অধীনে দূর শিক্ষণে এম এড কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্কুলে আরও কিছু ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষামূলক কোর্স চালু রয়েছে। যেমন Bachelor of English Language Teaching (BELT) এবং Bachelor of Agriculture in Education (B Ag Ed) প্রোগ্রাম ইত্যাদি। কোর্স দুটি যথাক্রমে স্কুল অব সোশাল সাইন্স, হিউম্যানিটিজ এ্যাণ্ড ল্যাংগুয়েজ ও স্কুল অব এগ্রিকালচার কর্তৃক পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অনেকেই দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে এসকল বিষযে পড়াশুনা করছেন। সারা বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে এই শিক্ষা বিষয়ক কোর্সগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিশেষত্ব হল-দেশের যে কোন প্রান্তে নিজ কর্মস্থানে বসে যে কেউ প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসাপেক্ষে এ কোর্সগুলো সহজে এবং অল্প খরচে করতে পারে। অতএব অসুবিধাগ্রস্থ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ সহজেই নিজ কর্মস্থলে থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্সগুলো করার মাধ্যমে পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজ/মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের ও শিক্ষকদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ একটি জরুরি বিষয়। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ অর্থ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণসহ পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের সাথে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে নায়েম কর্তৃক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। নায়েম কর্তৃক পরিচালিত এসকল কোর্স সম্পর্কে ইতোপূর্বে ৪.৮ নং পাঠে আপনারা বিস্তারিতভাবে অবহিত হয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

কর্মকালীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ

দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনেক আগে থেকে বিদ্যমান থাকলেও কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের কোন ব্যবস্থা ইতোপূর্বে ছিল না। নায়েম কেবলমাত্র প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষদের ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছিল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প আমলে দেশে প্রথমবারের মত পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে এসব প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় HSTTI। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কলেজ শিক্ষকদের জন্য ৫৬ দিনের কর্মকালীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিএড ও এমএড কোর্স

বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোর্স (বিএড এবং এম এড) চালুকরণ এবং ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সম্পূরক ভূমিকা পালন করে আসছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

নট্রামস

জাতীয় বহুভাষী সাটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী [National Training and Research Academy for Multilingual Short Hand (NTRAMS)] বগুড়ায় অবস্থিত। ১৯৮৩ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের পাশপাশি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রবর্তিত পরিমার্জিত মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক (নবম-দশম শ্রেণী) ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এই কম্পিউটার কোর্স যাতে শিক্ষকবৃন্দ উপযুক্ততা ও দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন সে উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কম্পিউটার শিক্ষকদের জন্য তিনমাসের আবাসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। নট্রামস এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার কোর্স খোলার অন্যতম শর্ত হল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে একজন শিক্ষকের NTRAMS থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী দুই বা তিন মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও ইনসার্ভিস সার্টিফিকেট কোর্স

মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উপধারা মাদ্‌রাসা শিক্ষা। ১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যানুযায়ী দেশে বর্তমানে ৬,৮৩৬ টি মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের মাদ্‌রাসা আছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে ৮৭,১২২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া ইবতেদায়ী পর্যায়ে রয়েছে আরও ৯,৫৫১ টি মাদ্‌রাসা ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষক। মাদ্‌রাসাসমূহের এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণার্থে গাজীপুরে মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এখানে মাদ্‌রাসা প্রধানদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য ইনসার্ভিস সার্টিফিকেট কোর্স চালু রয়েছে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়ে থাকে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিদ্যালয়ে যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে শিক্ষকদের ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষকবৃন্দ যেন শ্রেণীকক্ষে যথাযথ পাঠদান করতে পারেন সেজন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রয়োজন হয়। যেহেতু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, সেহেতু শিক্ষাক্রম বিস্তরণের কাজটিও এনসিটিবি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৭ সালে প্রবর্তিত ও পরিমার্জিত মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে এনসিটিবি শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচীর অধীনে মাস্টার ট্রেইনার, কোর ট্রেইনার, ফিল্ড লেভেল ট্রেইনার এবং শ্রেণী শিক্ষকসহ ১,৫২,২০৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর পূর্বে যখন মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয় তখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের কৃষি শিক্ষা বিষয়ে এবং তারও পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ তথা কর্মকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও বিতরণের মাধ্যমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যুগোপযোগী জ্ঞান ও ধারণা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে এবং শ্রেণীর পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার গুণগত মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমস্যা

বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং গতানুগতিক। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী নয়। এছাড়া ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের দিকটিও অবহেলিত হচ্ছে। চাকুরীরত অবস্থায় পৌনঃ পৌনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ একবারেই সীমিত। কেবলমাত্র বিস্তরণ কর্মসূচির আওতায় গুটি কয়েক শিক্ষককে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও অধিকাংশ শিক্ষকই এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ পান না। অতএব ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষা বিজ্ঞানের ও শিক্ষাক্রম পরিমার্জন এবং নবায়নের নবতর ধ্যান ধারণা সম্পর্কে ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কর্মস্থানে থেকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে স্বল্পখরচে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে?
   ক) আই ই আর
   খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
   গ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
   ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

২। বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম সমস্যা হল-
   ক) চাকুরীরত অবস্থায় পৌনঃপৌনিক প্রশিক্ষণের অভাব
   খ) অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী নয়
   গ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অভাব
   ঘ) ওপরের সবগুলো

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন
২। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
৩। আই/ই/আর এর শিক্ষা কার্যক্রমে কি ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে?
৪। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্সগুলো কি? এই কোর্সগুলোর বিশেষত্ব উল্লেখ করুন।
৫। বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমস্যাগুলো কি?
৬। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মানোন্নয়নে পাঁচটি সুপারিশ লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় এনসিটিবি এবং নট্রামস কি ভূমিকা পালন করে?
২। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং এদের কার্যসমূহ বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

১। গ, ২। ঘ।

পাঠ-৪.১২ মাদ্‌রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

[Administration and Management of Madrasha Education]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তরের তুলনামূলক বিবরণ দিতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিধি উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত করতে পারবেন এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম শিক্ষা উপধারা হল মাদ্‌রাসা শিক্ষা। এটি মুলত ইসলামী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষার মতই প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল-কুরআন ও হাদীসের প্রতিফলন ঘটিয়ে তাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এ শিক্ষা ধারায় লেখাপড়া করছে। যদিও শিক্ষার্থীদের ইসলামী ধারার শিক্ষা প্রদান মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি বিভিন্ন সংস্কার ও পরিমার্জনের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক (দাখিল) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) স্তরকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমমানে উন্নীত করে একাডেমি। স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তর

সাধারণ শিক্ষা উপধারার মত মূলত মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপধারারও রয়েছে পাঁচটি স্তর। এগুলো হল ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল। ১৯৮৫ সালে দাখিলকে মাধ্যমিক ও ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক মানে উন্নীত করা হয়। নিচের ছকে সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা উপধারার বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের একটি তুলনামুলক বিবরণ দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তর	সাধারণ শিক্ষার স্তর ও সমমান	মেয়াদ
১	ইবতেদায়ী	প্রাথমিক	৫ বৎসর
২	দাখিল	মাধ্যমিক	৫ বৎসর
৩	আলিম	উচ্চ মাধ্যমিক	৫ বৎসর
৪	ফাযিল	স্নাতক	২ বৎসর
৫	কামিল	স্নাতকোত্তর	২ বৎসর

মাদ্‌রাসার সংখ্যা

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিসর

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৯,৫৫১ টি ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, ৪,৮২৬টি দাখিল মাদ্‌রাসা, ৯৯৬টি আলিম মাদ্‌রাসা, ৯৫৮টি ফাযিল মাদ্‌রাসা এবং ১২৬টি কামিল মাদ্‌রাসা রয়েছে। কেবলমাত্র তিনটি কামিল মাদ্‌রাসা ব্যতীত সকল মাদ্‌রাসা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থী সংখ্যা

১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যানুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১,০৯,৭৬১ জন। এর মধ্যে কেবল মাধ্যমিক স্তরের (দাখিল ও আলিম) শিক্ষার্থী সংখ্যা হল ১৬,৯০,৯৪৫ জন। এ থেকে সহজেই অনুমেয় মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষার্থী সংখ্যা কম নয় এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক পরিসংখ্যান থেকে এ চিত্র সহজেই অনুমেয়।

পরীক্ষার্থী	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	
	১৯৮৩ সাল	১৯৯৯ সাল
দাখিল পরীক্ষার্থী	২২,৭৯৯	১,৩৫,৯৭৪
আলিম পরীক্ষার্থী	৯,৪২৩	৫৮,২০০
ফাযিল পরীক্ষার্থী	৫,২৩৭	২০,৯৩২
কামিল পরীক্ষার্থী	২,৪৭৮	১০,৬২১
সর্বমোট	৩৯,৯৩৭	২,২৫,৭২৭

উৎস : জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ রিপোর্ট

মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কেবলমাত্র তিনটি মাদ্‌রাসা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মাদ্‌রাসাই বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। এসব মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক এবং একাডেমিক নিয়মকানুন ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের। তবে সরকারি বেসরকারি মাদ্‌রাসাগুলোর প্রশাসন তথা পরিচালনার দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। এছাড়া অধিদপ্তর সকল এমপিও ভুক্ত বেসরকারি মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের এমপিও প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং মাউশি ছাড়াও মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সাথে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো হল-

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
২। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
৩। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট
৪। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
৫। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী

এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালের মাদ্‌রাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ৪ঠা জুলাই "বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। তাঁকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন একজন রেজিস্ট্রার, একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন মাদ্‌রাসা পরিদর্শক। এছাড়া আরও আছেন উপ রেজিস্ট্রার, উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ মাদ্‌রাসা পরিদর্শক। এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বমোট ১২০ জন জনবল রয়েছে। নিচে এর সাংগঠনিক কাঠামো ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

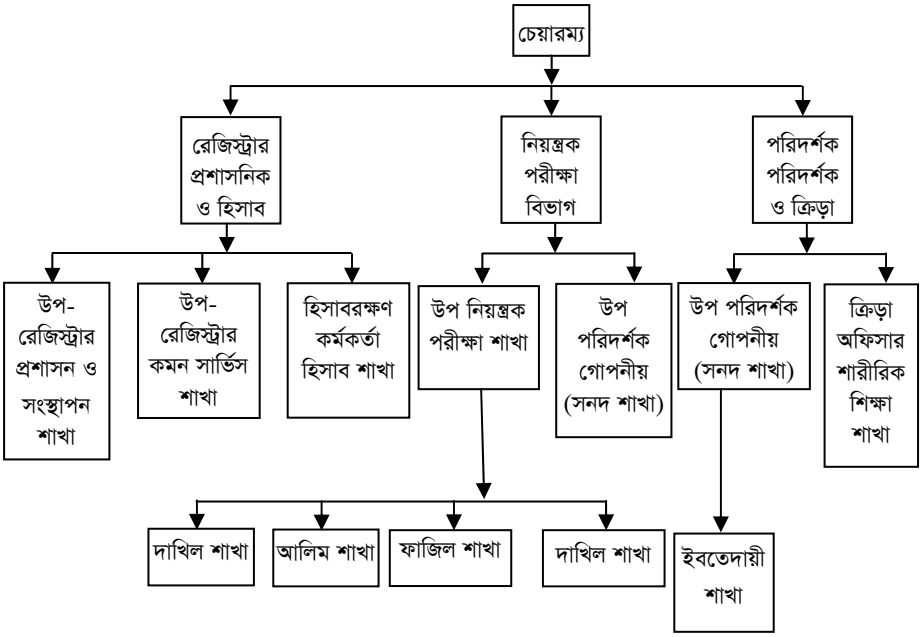

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালনা, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন;
২। মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যসূচি নির্ধারণ;
৩। মাউশি বা বোর্ডের পরিদর্শন শাখার পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান অথবা অনুমোদন প্রত্যাহার বা স্থগিত রাখা;
৪। বিভিন্ন ধরনের মাদ্‌রাসায় (দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল) শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং বদলী সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণ;
৫। মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের প্রক্রিয়া ও ধরন নির্ধারণ;
৬। প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত যেকোন মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭। দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল ইত্যাদি পরীক্ষা বা অন্য যে কোন স্তরের পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮। বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফল প্রকাশ;
৯। পরীক্ষায় যারা পাশ করে তাদেরকে সনদ, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে এগুলো প্রত্যাহার;
১০। শিক্ষক এবং মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা বা মীমাংসার ব্যবস্থাকরণ;
১১। বোর্ড সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
১২। বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা, পদবী এবং বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে অর্ডিনেন্স-এর প্রবিধান অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ;
১৩। যে কোন পদ সৃষ্টি বা বিলোপসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৪। শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি হিসেবে ভাতা, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি, পদক ও পুরস্কার প্রদান;
১৫। মাদ্‌রাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স এবং বিভিন্ন রেগুলেশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধিতে চুক্তি সম্পাদন ও তা অনুসরণ;
১৬। মাদ্‌রাসার কাজ পরিচালনার জন্য ভবন, আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, উপকরণাদি, বই এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থাকরণ;

১৭। ইবতেদায়ী, দাখিল আলিম, ফাযিল এবং কামিল স্তরের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ বা অনুমোদন এবং

১৮। অর্ডিনেন্স অনুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

বোর্ড বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। কমিটি সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল একাডেমিক কমিটি, অর্থ কমিটি, শিক্ষাক্রম ও বিষয় কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, মনোনয়ন কমিটি ইত্যাদি। বোর্ড কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে আরও বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসী শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৭৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাদ্‌রাসাসমুহের ব্যবস্থাপনা তদারকীর জন্য ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের প্রবিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের। মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে অধ্যক্ষগণ মাদ্‌রাসাসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার (দাখিল এবং আলিম) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির। একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ; পদ মঞ্জুরীকরণ; চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ; শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; মাদ্‌রাসার ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;' ছুটি মঞ্জুর, আর্থিক অগ্রীম প্রদান, ছুটির তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি ম্যানেজিং কমিটির দায়-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষার কোন স্তর দুটি সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শিক্ষার সমমানের?
   ক) ইবতেদায়ী ও দাখিল
   খ) দাখিল ও কামিল
   গ) ফাযিল ও কামিল
   ঘ) দাখিল ও আলিম

২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা-
   ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
   গ) বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
   ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাদ্‌রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কি ধরনের উন্নয়নের সহায়তা করে?
২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তরগুলো কি? এগুলো কত বছর মেয়াদী?
৩। সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্তরগুলোর তুলনামূলক বিবরণ দিন।
৪। মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কি?
৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাদ্‌রাসা শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কি দায়িত্ব পালন করে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।
২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করুন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিবৃত করুন।

সঠিক উত্তর

১। ঘ, ২। গ।

ইউনিট ৫

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

[Administration and Management of Non-government Secondary Education Institutions]

ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াটি মূলত কেন্দ্র নির্দেশিত এবং এতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের তেমন কোন সুযোগ নেই।

কেন্দ্র নির্দেশিত এই প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বাহিরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দিকটি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন সরকারি স্কুল ও কলেজ এবং বেসরকারি স্কুল ও কলেজ। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিংহভাগই বেসরকারি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রাণাধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিষয় দেখাশুনা করে এবং বাদবাকী বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের। ফলে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে যাতে এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের বিধান রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গভর্ণিং বডি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। স্থানীয় জনগণ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে এসব কমিটি গঠিত হয়। কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপনাগত দায়দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। বর্তমান ইউনিটে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এ দুটি বিধিবদ্ধ সংস্থা-ম্যানেজিং কমিটি এবং গভর্নিং বডির গঠন পদ্ধতি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিটটি নিম্নলিখিত দুটি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ-৫.১ : বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি
পাঠ-৫.২ : বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্ণিং বডি

পাঠ-৫.১ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি

[Non-government Secondary School Managing Committee]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্য পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ্য করতে পারবেন।

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক। তদুপরি স্কুলের প্রধান নির্বাহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একাই অথবা নিজ কর্তত্বে কাজ করেন না। বিভিন্ন আইন কানুন, বিধি, প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশাবলি ইত্যাদির আওতায় তাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। এ সব কিছুর উৎস হল সরকার। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির ওপর অর্পিত হয়েছে। ভাল একটি ম্যানেজিং কমিটির ওপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্তমান পাঠে ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্য পদ্ধতি

গঠন পদ্ধতি

১৯৭৭ সালে জারীকৃত ম্যানেজিং কমিটি বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। প্রতিটি ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসংখ্যা ১১ জন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব হবেন পদাধিকার বলে। বাকি নয়জন বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত সদস্য। নিম্নে ম্যানেজিং কমিটির গঠন পদ্ধতি উপস্থাপিত হল।

ক্রমিক নং	পদ	কে হবেন	সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান	জেলা সদরে অবস্থিত স্কুলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর মনোনীত একজন এডিসি বা ম্যাজিস্ট্রেট বা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা। জেলা সদরের বাহিরের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা বা অন্য কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।	১ জন
২	সদস্য সচিব	স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা-পদাধিকার বলে	১ জন
৩-৪	সদস্য	শিক্ষক প্রতিনিধি:-স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য থেকে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত।	২ জন
৫-৮	সদস্য	অভিভাবক প্রতিনিধি:-অভিভাবকদের মধ্য থেকে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত।	৪ জন
৯	সদস্য	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যিনি এক সাথে পনের হাজার টাকা নগদে বা পণ্যের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে প্রদান করেন।	১ জন

১০	সদস্য	দাতা প্রতিনিধি:-দাতাদের মধ্য থেকে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যিনি একসঙ্গে দশ হাজার টাকা স্কুল ফাণ্ডে দান করবেন।	১ জন
১১	বিদ্যানুরাগী সদস্য	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও বিশেষ শিক্ষা কর্তৃক মনোনীত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি	১ জন
		মোট	১১ জন

এছাড়া কমিটিতে একজন সহসভাপতি থাকবেন। তিনি কমিটির সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। তবে সদস্য সচিব এবং শিক্ষক সদস্যগণ সভাপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য হবেন না। কমিটির প্রথম সভায় সহসভাপতি নির্বাচিত হবেন যিনি অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ

ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ হবে প্রথম সভার তারিখ থেকে তিন বছর। পরবর্তী কমিটির প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করবেন। যদি কোন কারণবশত নির্ধারিত সময় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটি বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালনা করবে।

কোরাম

কমিটিতে ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে ৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটি তার সভা বা বৈঠক চালিয়ে যেতে পারবে।

সভা অনুষ্ঠান

বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুন কমিটির সভা আহবান করতে হবে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কমিটি প্রতিবছর যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধানে কমপক্ষে ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত করবে। দুটি সভার অন্তবর্তীকালীন সময় কোন অবস্থাতেই ৬০ দিনের বেশি হতে পারবে না। সভার সময় ও তারিখ সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব নির্ধারণ করবেন। সভাপতি সভা আহবান করতে পারবেন। সকল সভা স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সভার জন্য সাত দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। তবে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে সদস্য সচিব সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন। সভাপতিও জরুরি সভা আহবান করতে পারেন। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত রিকুইজিশনের ভিত্তিতে ১৫ দিনের নোটিশে বিশেষ সভা হতে পারে।

কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া

কোন কমিটির অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বা এ ধরনের অন্যান্য কারণ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা উপ-পরিচালক মাধ্যমিক-এর সুপারিশের ভিত্তিতে কমিটি ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের থাকবে। বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে বা শৃঙ্খলা ও আচরণ ভঙ্গের কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলেও বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিতে পারবে। তবে এর পূর্বে বোর্ড কর্তৃক কমিটিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। জবাব মনঃপুত না হলে বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দিবে এবং ভেঙ্গে দেওয়ার তারিখ থেকে কমিটি কার্যকারিতা হারাবে।

এডহক কমিটি

মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কমিটি ভেঙ্গে দিলে বোর্ড সাময়িকভাবে কাজ পরিচালনার জন্য ছয় মাসের একটি এডহক কমিটি গঠন করবে। এডহক কমিটি নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

ক্রমিক নং	পদ	কে হবেন	সংখ্যা
১	সভাপতি	জেলা সদরে জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন এডিসি বা ম্যাজিস্ট্রেট বা টি এন ও কিংবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ।	১ জন
২	সদস্য সচিব	স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদাধিকার বলে	১ জন
৩	সদস্য	শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী	১ জন
৪	সদস্য	উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক	১ জন
৫	সদস্য	জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ও জেলার বাইরে টি এন ও মনোনীত অভিভাবক	১ জন
		মোট	৫ জন

কমিটির সদস্যপদের অযোগ্যতা

তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে এডহক কমিটির কোরাম হবে। এডহক কমিটি নিয়মিতভাবে কমিটির সকল কাজ পরিচালনা করবে। তবে এর প্রধান দায়িত্ব হবে নিয়মিত কমিটি গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য হতে বা সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না ।

কমিটির সদস্যদের অযোগ্যতা

ক) রাষ্ট্রের নাশকতামূলক কাজে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করলে;

খ) অর্থনৈতিক কাজের দরুণ কোন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হলে;

গ) শিক্ষক বাদে স্কুলের কোন কর্মচারী হলে এবং

ঘ) পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে ।

কমিটির আর্থিক কার্যকলাপ

কমিটি স্কুলের নামে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংকে কিংবা সিডিউল ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলবে। তিন শত টাকার বেশি হলে তা স্কুলের একাউন্ট-এ জমা দিতে হবে। ব্যাংক একাউন্ট সহ-সভাপতি ও সদস্য সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। সহ সভাপতির অনুপস্থিতে কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যের স্বাক্ষরসহ একাউন্ট পরিচালিত হবে ।

ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে

কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
২। শিক্ষক নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত ও অপসারণ;
৩। নৈমিত্তিক ছুটি বাদে অন্যান্য ছুটি মঞ্জুর;
৪। উন্নয়ন প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
৫। শিক্ষক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের আবেদন মঞ্জুর;
৬। ছুটির দিনের তালিকা অনুমোদন;
৭। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান যেগুলো কমিটির সামনে আনা হবে;
৮। ছাত্রদের স্থান সংকুলান ও শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;
৯। জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই, লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের আয়োজন করা ।
১০। রিজার্ভ ফাণ্ড, ভবন ফাণ্ড, খেলাধুলার ফাণ্ড, লাইব্রেরি ফাণ্ড, পুরস্কার ফাণ্ড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পরীক্ষা ফাণ্ড, গ্রাচুইটি ফাণ্ড, বেনেভলেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ড সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১১। স্কুলের মাঠ, ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ;

১২। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩। স্কুলের সন্তোষজনক কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

১৪। অ-আদায়যোগ্য ঋণ মওকুফ করা, বিনষ্ট যন্ত্রপাতি নিষ্পত্তি ও দায়সমূহের অর্থ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া;

১৫। প্রিসেশন সম্মেলনের ব্যবস্থা করা যাতে গত বছরের কর্ম মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে;

১৬। বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত নির্দেশনা বলে কমিটি ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

১৭। কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে। এছাড়া একটি স্ট্যাণ্ডিং অর্থ সাব কমিটি থাকবে যা প্রতি মাসে সভা করবে ও স্কুলের প্রতি মাসের হিসাব নিরীক্ষা করবে।

১৮। কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে। এছাড়া একটি স্ট্যাণ্ডিং অর্থ সাব কমিটি থাকবে যা প্রতি মাসে সভা করবে ও স্কুলের প্রতি মাসের হিসাব নিরীক্ষা করবে।

তবে ম্যানেজিং কমিটি নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

১। স্কুলের নাম পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না।

২। বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে অপসারণ বা বরখাস্ত করা যাবে না।

ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব

এডহক কমিটি উত্তম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিধান করতে হবে।

এই ইউনিটের শুরুতে আমরা জেনেছি বাংলাদেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ সরকার এসব বিদ্যালয়ের কতিপয় দিক দেখাশোনা করে। বাকী বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সম্ভব নয় বলে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ম্যানেজিং কমিটির দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ও সততার ওপর নির্ভরশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ম্যানেজিং কমিটি অন্তর্দন্দ্বের কারণে সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার অনেক বিদ্যালয়ই নিয়মিত কমিটির অভাবে এডহক কমিটি দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চরমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমানের ক্রমোবনতি, পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি ও পাশের নিম্নহার, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি ব্যার্থতার দায় দায়িত্ব কেবল সরকার বা শিক্ষকমণ্ডলীর নয়। ম্যানেজিং কমিটিগুলোর সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের ব্যার্থতাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। জাতীয় শিক্ষার মান বাড়াতে হলে তাই ম্যানেজিং কমিটিকে সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে বিদ্যালয়ে উত্তম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তাবিধানে সক্রিয় এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এর রূপরেখা ঢেলে সাজাতে হবে এবং যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত সুষ্ঠু বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা কল্পনাপ্রসূত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সংখ্যা কয়জন?
   ক) ৯ জন
   খ) ১০ জন
   গ) ১১ জন
   ঘ) ১২ জন।

২। কোন ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
   ক) প্রধান শিক্ষকের অপসারণ
   খ) শিক্ষক নিয়োগ প্রদান
   গ) বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন
   ঘ) বিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্তন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে কয়জন অভিভাবক প্রতিনিধি আছেন? তাঁরা কিভাবে নির্বাচিত হন?

২। ম্যানেজিং কমিটির সভা আহ্বান পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৩। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যপদের অযোগ্যতা কি?

৪। ম্যানেজিং কমিটির কোন কোন ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার নেই?

৫। ম্যানেজিং কমিটিকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য চারটি সুপারিশ লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

ক) ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করুন।

খ) ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

গ) ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। কমিটির যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ফলে বিদ্যালয়ে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

সঠিক উত্তর

১। গ, ২। খ।

পাঠ-৫.২

বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্নিং বডি

[Governing body of Non-government Higher Secondary College]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গভর্নিং বডির গঠন ও কার্যপদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যেমন রয়েছে ম্যানেজিং কমিটি তেমনি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে গভর্নিং বডি। এটি বেরসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের পরিচালনা পরিষদ। এই পরিচালনা পরিষদ ছাড়া কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করা যায় না। যে কোন বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডি গঠন অপরিহার্য। এটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

গভর্নিং বডির গঠন ও কার্যপদ্ধতি

১৯৭৭ সালে বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্নিং বডি বিধি অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্নিং বডি থাকবে। এর গঠন পদ্ধতি ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল।

গঠন পদ্ধতি

ক্রমিক নং	পদ	কে হবেন	সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান	জেলা সদরের কলেজের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং জেলার বাইরে জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত টিএনও।	১ জন
২	সদস্য সচিব	কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে	১ জন
৩-৪	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)	কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কলেজে স্কুল সেকশন থাকলে সেখান থেকে একজন এবং অন্যজন কলেজ সেকশন থেকে।	২ জন
৫-৬	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)	অভিভাবক মহল থেকে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত। স্কুল সেকশন থাকলে সেখান থেকে একজন এবং কলেজ সেকশন থেকে একজন।	২ জন
৭	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত সদস্য	১ জন
৮	দাতা সদস্য	দাতাদের মধ্য থেকে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত সদস্য	১ জন
৯-১০	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	একজন বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক এবং একজন অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত হবেন।	২ জন
১১	সদস্য চিকিৎসক	গভর্নিং বডি স্থানীয় একজন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসককে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।	১ জন
		মোট	১১ জন

কোরাম

পাঁচজন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। কিন্তু কলেজের স্কুল সেকশন থাকলে ছয় জন মিলে কোরাম হবে।

সদস্যদের জাতীয়তা

গভর্নিং বডির সদস্যদের জাতীয়তা হবে বাংলাদেশী বা অনুমোদন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভাবে গঠিত গভর্নিং বডির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে গভর্নিং বডির সদস্য হতে কিংবা সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না।

- যদি কেউ রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কোন কাজে অংশ নেয় বা সহায়তা করে;
- অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দরুন কোন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হলে;
- সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত ছুটি ছাড়া যদি কেউ পরস্পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
- কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি বাদে যদি তিনি কলেজের কর্মচারী হন;
- যে ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ঐ ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধিত্ব যদি আর না করেন।

গভর্নিং বডির মেয়াদ

কমিটি গঠনের পর প্রথম সভা থেকে গভর্নিং বডির মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে শিক্ষক প্রতিনিধি কেবল এক বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এসময় মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরও পূর্বতন কমিটি নতুন নির্বাচিত কমিটিকে দায়িত্বভার হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নেবেন।

সভা পরিচালনার পদ্ধতি

১। নতুন কমিটি গঠনের পর এবং বর্তমান কমিটির সময় মেয়াদ শেষ হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রথম সভা আহবান করতে হবে।

২। গভর্নিং বডির সভা যখনই প্রয়োজন হবে তখনই অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বছরে কমপক্ষে চারটি সভা যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। (জরুরী ও বিশেষ সভা ব্যতীত)।

৩। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে সদস্য সচিব সভার তারিখ ধার্য করবেন।

৪। সভার নোটিশ ও আলোচ্যসূচি একসাথে সাত দিন পূর্বে সদস্য সচিব রেজিস্ট্রার্ড ডাকে বা দূত মারফত সদস্য ও সভাপতি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

৫। দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সাত দিনের নোটিশে বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের জন্য রিকুইজিশন দিতে পারবেন। সদস্য সচিব এ ধরনের রিকুইজিশন পাওয়ার পরের দিনের মধ্যে সভা আহবান করবেন।

৬। জরুরি সভা চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং ছুটিকালীন সময়েও জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

৭। সভাপতি নিজ উদ্যোগেও গভর্নিং বডির সভা আহবান করতে পারবেন।

৮। সদস্য সচিব রেজিস্ট্রারে সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা অনুমোদন হলে তাতে সভাপতি ও সদস্য সচিব উভয়েই স্বাক্ষর করবেন।

গভর্নিং বডি বাতিলকরণ

অদক্ষতা, আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য এ ধরনের কারণে বিভাগীয় কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড যে কোন সময় কোন গভর্নিং বডি ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। অথবা বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ মোতাবেক গভর্নিং বডি শৃঙ্খলা আচরণ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে বোর্ড গভর্নিং বডি ভেঙ্গে দিতে পারবে। তবে এর পূর্বে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। গভর্নিং বডি নোটিশ পাবার ত্রিশ দিনের মধ্যে জবাব দেবে। বোর্ড কর্তৃক গভর্নিং বডি ভেঙ্গে দেওয়ার তারিখ থেকে তা কার্যকরী হবে।

এডহক কমিটি

গভর্নিং বডি ভেঙ্গে গেলে বা নির্ধারিত সময়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বোর্ড ছয় মাসের জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করবে। এডহক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে।

ক্রমিক নং	পদ	কে হবেন	সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান	জেলা সদরের কলেজের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিজে এবং বাইরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রার্থী ।	১ জন
২	সদস্য সচিব	কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে	১ জন
৩	সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত	১ জন
৪	সদস্য (অভিভাবক)	অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত	১ জন
৫	সদস্য	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত	১ জন

মোট=১১ জন

এডহক কমিটি গভর্নিং বডির দায়িত্ব চালিয়ে নিবেন এবং দ্রুত নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

সাধারণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১ । গভর্নিং বডি অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, ডেমোনস্ট্রেটর এবং ল্যাবরেটরী সহকারীদের (বোর্ডের শর্তানুযায়ী) নিয়োগ দিবেন ।

২ । তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদের মঞ্জুরী ও পদ নির্ধারণ, চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ এবং কারণিক পদে নিয়োগদান ও তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৩ । শিক্ষকদের বরখাস্ত, অপসারণ অথবা নিম্ন র‍্যাংকে নামিয়ে দেয়া । তবে শর্ত যে, কাউকে সুনানির সুযোগ না দিয়ে ও পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ।

৪ । গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগকৃতদের ছুটি, আর্থিক অগ্রীম, বোনাস বা গ্রাচুইটি মঞ্জুরকরণ । তবে অধ্যক্ষ যে সব তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেবেন তাদের ছুটি মঞ্জুরের ক্ষমতা অধ্যক্ষের থাকবে । কিন্তু আর্থিক সুবিধাদির বিষয়ে তিনি গভর্নিং বডির পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করবেন ।

৫ । পুরাতন অচল যন্ত্রপাতি, তাবু, আসবাবপত্র ও বইপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলেজের সাধারণ ফাণ্ডে জমাকরণ ।

৬ । অ-আদায়যোগ্য ফি ও ফাইন অব্যাহতি দানের ক্ষমতা ।

৭ । স্ট্রাকচার, ভবন, জমি, যন্ত্রপাতি, বইপত্র ক্রয় ও মেরামত কাজে অর্থ ব্যয়ের মঞ্জুরী প্রদান ।

৮ । কমনরুম, ম্যাগাজিন ও খেলাধূলার জন্য ছাত্রদের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে ট্যাক্স আরোপ;

৯ । বোর্ডের দেয় সীমার মধ্যে ছুটির তালিকা প্রস্তুতকরণ;

১০ । বিনা বেতনে ও অর্ধ বেতনে পড়ুয়া ছাত্রদের সংখ্যা নির্ধারণ এবং উপযুক্ত ছাত্রদের অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান;

১১ । শৃংখলামূলক মামলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

১২ । প্রয়োজনীয় তহবিল গঠন ও সংগ্রহ;

১৩ । কলেজের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা;

১৪ । কলেজের বার্ষিক বাজেট তৈরি করা, বাজেটের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন করা;

১৫ । কলেজের উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প হাতে নেয়া এবং তা পরীক্ষা ও বিবেচনা করা;

১৬ । কলেজের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

১৭ । বোর্ড ও সরকার কর্তৃক প্রেরিত পত্রাদির ওপর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া;

১৮ । বোর্ড বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে দেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

অর্থ কমিটি গঠন

গভর্নিং বডি একটি স্থায়ী অর্থ কমিটি গঠন করবে। ঐ কমিটি প্রতি মাসে কলেজের হিসাব পরীক্ষা করবে এবং প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

১। অধ্যক্ষ কর্তৃক দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা (সম্পূর্ণ শিক্ষা বিষয়ক কাজ)।

২। কলেজের ছাত্র ভর্তি, ছাত্রদের ক্লাসে উন্নীতকরণ বা ক্লাসে উন্নীতকরণ বন্ধ করা। এসব বিষয় সম্পূর্ণরূপে অধ্যক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গভর্নিং বডির হস্তক্ষেপ চলবে না।

গভর্নিং বডি যেসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন।

১। গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন নিরীক্ষক প্রতি বছর কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করবেন। পূর্ব বছরের হিসাব নিরীক্ষা করে নিরীক্ষক গভর্নিং বডির নিকট এক কপি ও বোর্ডের নিকট এক কপি রিপোর্ট পেশ করবেন। অডিট ফি কলেজের ফাণ্ড থেকে নির্বাহ করতে হবে।

অডিট

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির মত গভর্নিং বডি বেসরকারি উচ্চমাধ্যমিক কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভূত দায়িত্বের অধিকারী। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ মান সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার মানকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে তাই গভর্নিং বডিকে হতে হবে সক্রিয়, তৎপর, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বসম্পন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। গভর্নিং বডির মেয়াদ কত বছর?

ক) ১ বছর
খ) ১.৫ বছর
গ) ২.৫ বছর
ঘ) ৩ বছর।

২। গভর্নিং বডির সদস্যপদের একটি অযোগ্যতা হল-

ক) আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হওয়া
খ) ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণ
গ) পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিতি
ঘ) ওপরের সবগুলো।

৩। গভর্নিং বডি কলেজের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না?

ক) ক্লাশে উন্নীতকরণ
খ) তহবিল সংগ্রহ
গ) চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ
ঘ) অর্থ কমিটি গঠন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে গভর্নিং বডির গুরুত্ব কি?
২। গভর্নিং বডির সভা পরিচালনা পদ্ধতি আলোচনা করুন
৩। গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার অযোগ্যতাগুলো কি?
৪। কি কারণে গভর্নিং বডি বাতিল করা যায় এবং কে করেন?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

ক) গভর্নিং বডির গঠন ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন
খ) গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

১। ঘ, ২। খ, ৩। ক

ইউনিট ৬

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা
[Problems of Secondary Educational Administration and Management]

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম দুর্বল দিক হল এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শিক্ষা ক্ষেত্রেই এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে বহুমুখী সুপারিশ করলেও এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এখন পর্যন্ত সেই সনাতন ধারাই বিরাজ করছে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪-এর মতে

If the old administrative system continues to prevail in the field of education even in the altered circumstances of freedom, our desired educational reform is not as in the past likely to materialize. the reconstruction of the administrative system in the field of education has therefore become imperative."

এরপর দীর্ঘ প্রায় ২৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ এদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রায় একই ধারণার পুনরাবৃত্তি করে। কমিটির মতে, "আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাই সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যান্ত জরুরি।"

দেশের সকল জনগণের জন্য শিক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের সাংবিধানিক অঙ্গিকার পূরনের লক্ষ্যে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার বর্তমানে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ফলশ্রুতিতে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্প। এছাড়া দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোও হয়ে উঠেছে বিশাল। এসব কার্যক্রমের সঠিক বাস্তাবয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয় যদি না তা সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত হয়। তাই একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সর্বাধিক সুফল পেতে হলে এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। আর তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সে অনুযয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমান ইউনিট পাঠের মাধ্যমে দূরশিক্ষার এম এড শিক্ষার্থীবৃন্দ মাধ্যমিক শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং সমস্যা দূরীকরণের উদ্বুদ্ধ ও সচেষ্ট হবেন। সমগ্র ইউনিটটি কেবলমাত্র একটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত হল।

পাঠ ৬.১ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঃ সমস্যা ও সমাধান

পাঠ-৬.১

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও সমাধান

[Secondary Education Administration and Management : Problems and Remedies]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- দুর্বল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন ।

ভূমিকা

শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে যথাযথ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর । সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় । আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ । জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ এর মতে "দেশে বর্তমাননে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে । শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরে একই কাজের পুনরাবৃত্তিসহ একাধিক সংস্থায় একটি কাজের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে । দ্বৈত ও দ্বিমুখী ব্যবস্থাপনার ফলে কালক্ষেপনসহ প্রশাসনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে । তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরি ।"

একজন সফল শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপককে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটিগুলো জানার মাধ্যমে সেগুলো দূরীকরণে যথার্থ প্রয়াস চালাতে হবে । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান পাঠে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, এর ফলে সৃষ্টি সমস্যা এবং তা নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা

অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ

প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অত্যাধিক কেন্দ্রীকরণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি । বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রে কতগুলো দপ্তর ও অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে । বর্তমানে আঞ্চলিক বা মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের নিকট মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই । ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত যা কোনভাবেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

জনশক্তির স্বল্পতা

শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম । বর্তমানে শিক্ষায় যে ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা এই সীমিত জনবল দিয়ে যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না । ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম হচ্ছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ভোগান্তি বাড়ছে ।

বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে । শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে এবং নানা স্তরে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে থাকে । উদাহরণস্বরূপ আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিস নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রশাসনিক ও

একাডেমিক পরিদর্শন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী।

অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয় স্থাপন

কোন প্রকার স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রম না থাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই কোন নিয়মনীতি মানা হয় না। ফলে যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও ভৌত সুযোগ সুবিধার অভাব বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার মানের ক্রমোবনতি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের একটি বিরাট ত্রুটি।

অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তির সম্পৃক্ততার অভাব

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি ও অনভিজ্ঞতাদের দ্বারা এসব কাজ করানো হয়। ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে এবং নীতি নির্ধারণের যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানের বিভিন্নতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের দেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিধি বিধান আলাদা। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের বিধি বিধানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম

আমাদের দেশে অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং পদ্ধতি নেই। একটি চাকুরি বিধি ও নীতিমালার আলোকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি ইচ্ছামাফিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে। ফলে নিয়োগের ক্ষেতে ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। এতে করে অনেক সময় প্রকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ লাভে বঞ্চিত হয়। এভাবে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রবণতা এবং পাশের নিম্ন হার অন্তত এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

সুযোগ সুবিধার পার্থক্য

সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষগণ বেতনের একটি অংশ সরকার কর্তৃক অনুদান হিসেবে পেয়ে থাকলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মত পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পান না। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পদোন্নতির তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এই বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ সুষ্ট নীতিমালার অভাব

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করেছে এবং এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের জেষ্ঠতা, গ্রেডেশন তালিকায় তাঁদের নামের অন্তর্ভুক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির অসমতা

প্রচলিত পদ্ধতিতে কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতিতে অসমতা রয়েছে। এতে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে একসাথে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদান করেও কোন কোন বিষয়ে পদ খালি থাকায় কেউ দ্রুত পদোন্নতি পাচ্ছেন। অন্যদিক কিছু কিছু বিষয়ের শিক্ষকগণ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদশূন্যতার কারণে পদোন্নতি পাচ্ছেন না। এতে করে তাঁদের মধ্যে হতাশা ও কর্ম অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করছে।

পদোন্নতির অনিয়ম

শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই পদে কর্মরত রয়েছে। এ অবস্থা তাদের মধ্যে হতাশা ও

কর্মঅনীহা সৃষ্টি করছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ছে এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির অনুপস্থিত

আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি নাই। ফলে অনেকক্ষেত্রে উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে জটিলতার সৃষ্টি হয় যা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্নতার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরনের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

বহুবিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নানাভাবে বিভক্ত। এদেশে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি মালিকাধানী বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, যেমন কিণ্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও লেভেল এবং এ লেভেল, প্রি ক্যাডেট ইত্যাদি। এদের ওপর সরকারের তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে যা অভিন্ন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিপন্থী।

দুর্বল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান উপরিউক্তি জটিলতার কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলো সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে যা বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে বিব্রত করছে। পরবর্তী আলোচনায় এসব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিক্ষার মান হ্রাস

বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজে শিক্ষার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্কুলগুলোতে ভাল শিক্ষকের অভাব, উপযুক্ত একাডেমিক পরিবেশের অভাব, শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী।

শ্রেণীকক্ষে অনুন্নত পাঠদান

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ব্যতীত কেবল পরিমাণগত উন্নতি জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নির্ভর করে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম; শিক্ষদের প্রশিক্ষণের অভাব, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের অভাব; শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জাবাদিহিতার অভাব ইত্যাদি কারণে শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলির মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না এবং তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

নকল প্রবণতা

উপরিল্লিখিত কারণে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় লাগামহীন নকল প্রবণতা সমাজে একটি দুষ্ট ক্ষত হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেও এই নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। মাধ্যমিক শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতাই এর অন্যতম কারণ।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সমস্যা

রাজধানী ও শহরের ভাল স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সমস্যা বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে সকল স্কুল শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে পারছে না বলেই ভাল স্কুলগুলোতে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশন

বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের যথাযথ জবাবদিহিতার অভাবে শ্রেণীকক্ষের একাডেমিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনির প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে শিক্ষার্থীরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

দুর্বল পরিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কারণে বিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সম্ভপর হচ্ছে না। ফলে শিক্ষা কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

ম্যানেজিং কমিটির অদক্ষতা

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেগুলার ম্যানেজিং কমিটি দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এডহক কমিটি নিয়ে কাজ করছে। ফলে শিক্ষাসহ প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বাঙ্গীন উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্বল প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মত কিণ্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠছে। অনেকক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষার শিক্ষাক্রমের সাথে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বিদেশী ধাচের। ফলে এই শিক্ষাক্রমে অনেক সময় দেশীয় সংস্কৃতি, জাতীয় মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদির অভাব লক্ষ করা যায়। এ ধরনের বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা সমাধানের উপায়

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ। ফলে যুগের চাহিদা অনুযায়ী একটি উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের স্বার্থে বর্তমান প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্নবিন্যাস জরুরি হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

বর্তমানের কেন্দ্রীভুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। এই বিকেন্দ্রীকরণ কেবলমাত্র কাগজে কলমে নয়, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন তদারকির কোন ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে রাজধানী থেকে বিকেন্দ্রীকরণ করে থানা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হলে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

যথাযথ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে। এ উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যানুসারে বিদ্যালয় পরিদর্শক/পরিদর্শিকার পদ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে প্রতিটি বিদ্যালয় প্রয়োজন অনুসারে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি আর্থিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানকেও প্রাধান্য দিতে হবে।

জনবল বৃদ্ধি

শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের জনবল বাড়াতে হবে। কারণ বর্তমানের অপ্রতুল জনবল নিয়ে ক্রমবর্ধনশীল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মপরিধির সাথে সঙ্গতি রেখে এর কাঠামোগত পরিবর্তন এবং জনবল বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয় সাধন

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। ফলে একই মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা। এই বহুমুখী ব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে হলে যথাযথ সমন্বয় সাধনের উপায় উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

জবাবদিহিতার ব্যবস্থা

মাধ্যমিক শিক্ষায় গতিশীলতা ও দায়বদ্ধতা আনতে হলে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণসহ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল স্তরের কাজে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পরিদর্শন অবকাঠামো তৈরি

একাডেমিক সুপারভিশন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষ ও স্বতন্ত্র্য এবং একই ধারার প্রশাসনিক ও একাডেমিক অবকাঠামো গঠন করে অঞ্চল, জেলা, থানা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে হবে।

অভিজ্ঞ লোকদের সম্পৃক্ত করা

শিক্ষার সাথে জড়িত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে নিযুক্ত করতে হবে। এতে করে শিক্ষার মান উন্নত হবে। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রুটি হ্রাস পাবে।

স্কুল ম্যাপিং

স্কুল ম্যাপিং, কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অনুমোদন প্রদান করতে হবে। এতে করে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা বন্ধ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতিও হ্রাস পাবে।

শিক্ষক নিয়োগ বিধি তৈরি

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি নিয়োগ বিধি ও সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠন এবং তাদের ক্ষমতার ব্যবহার সুনিশ্চিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন

দেশে বর্তমানে শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ পদ্ধতি চালু আছে। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পূর্বেই নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেবেন। ভবিষ্যতে এদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বৈষম্য দূরীকরণ

সরকারী ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে বিরাজমান সুযোগ সুবিধার অসমতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমান সুযোগ দিতে হবে। এতে করে বেসরকারি শিক্ষকরা অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হবে এবং তাঁদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয়করণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালায় কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের স্বার্থ যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণ

আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শিক্ষা পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সময় ও মেধার অপচয় হয় এবং কাজ দীর্ঘায়িত হয়। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় না এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার কররার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিরাজমান। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী। এই অবনতিশীল পরিস্থিতি থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করতে হলে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে এর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন (উদাহরণস্বরূপ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি 'ক' হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধরন কিরূপ?
   ক) বিকেন্দ্রীভূত
   খ) কেন্দ্রীভুত
   গ) ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন
   ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে ন্যস্ত।

২। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্বল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রভাব কী?
   ক) শিক্ষার মানের অবনতি
   খ) ম্যানেজিং কমিটির অদক্ষতা
   গ) নকল প্রবণতা বৃদ্ধি
   ঘ) ক, খ এবং গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান দুটি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করুন।
২। দুর্বল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার মান কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।
৩। মাধ্যমিক শিক্ষার অত্যাধিক কেন্দ্রীকরণের সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায়।
৪। মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা কি?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান সমস্যাগুলো আলোচনা করুন। কিভাবে এই সমস্যাগুলো দুরীভূত করা যায়?
২। দুর্বল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাগুলো কি? এই সমস্যাগুলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে?

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ঘ।

ইউনিট ৭

বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

[Administration & Management of Technical & Vocational Education in Bangladesh]

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সবল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সম্পদকে সঠিক পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবহার সুনির্দিষ্ট করে লক্ষ্য অর্জন করাকেই ব্যবস্থাপনা বলে। সে কারণে ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আর্ট/কৌশল বলা হয়ে থাকে। সমকালীন বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা কর্মকাণ্ডেও নতুন নতুন মাত্রা, কলা কৌশল বিশেষ করে শিক্ষা প্রশান ও ব্যবস্থাপনায় সংযোজিত হচ্ছে। আর এ জন্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নীত করা। এরূপ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষার প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা সমগ্র ব্যবস্থাপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই বর্তমান সরকার প্রচলিত সকল ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও সময় উপযোগী করণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ইউনিটে আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন দিক/এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও ক্ষমতা সম্পর্কে চারটি পাঠের মাধ্যমে আলোচনা করব। নিচে এই পাঠগুলোর শিরোনামে উপস্থাপন করা হল :

পাঠ-৭.১ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিকাশ ও প্রশাসনিক কাঠামো

পাঠ-৭.২ : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা

পাঠ-৭.৩ : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্ল্যানিং ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ক্ষমতা।

পাঠ-৭.৪ : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোকেশনাল শিক্ষা), পরিচালক (পিআইইউ) ও পরিচালক (পিআইডব্লিউ) এর কর্তব্য এবং ক্ষমতা।

পাঠ-৭.৫ : ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা।

পাঠ-৭.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিকাশ ধারা ও প্রশাসনিক কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিকাশ ধারা বিবৃত করতে পারবেন;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তকালে বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল । আর যে টুকু ছিল তাও ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । ১৯৫০ সালের দিকে দেশের দক্ষ জনশক্তি ছিল খুবই অপ্রতুল । তখন এদেশে কারিগরি শিক্ষায় (১) আহছান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; (২) ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট; (৩) টেক্সটাইল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট; (৪) লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং (৫) সিরামিক ইনস্টিটিউট এগুলোর সব কয়টিই ঢাকায় অবস্থিত ছিল ।

দেশের অন্যান্য স্থানে কয়েকটি ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল, কারিগরি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আমিন শীপ, নির্মাণ কাজ তত্বাবধান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি চালু ছিল । এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খুবই নিম্নমানের কারিগরি গড়ে উঠত ।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক অধিদপ্তর স্থাপন

১৯৬০ সালে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগঠন, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকুশলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হয় । অধিদপ্তর ১৯৬০ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিকাশ ও অগ্রগতি (সুযোগ সুবিধাসহ) সাধিত হয় । নিম্নে এরূপ সম্প্রসারণের প্রধান ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল?

স্নাতক পর্যায়

কারিগরি শিক্ষায় নতুন নতুন ডিগ্রি

(১) আহছান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে "বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি" তে রূপান্তর ।

(২) ঢাকা (গাজীপুর), রাজশাহী খুলনা চট্টগ্রাম-এ চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন ।

(৩) ইনস্টিটিউট অব টেক্সাইল টেকনোলজি এবং ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজিকে যথাক্রমে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে উন্নীত করে স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালুকরণ ।

ডিপ্লোমা পর্যায়

ডিপ্লোমা কোর্স

বর্তমানে দেশে ২০টি পলিটেকনিক্যাল ও তিনটি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে । প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রদান করা হচ্ছে । মনোটেকনিক-এর একটিতে সার্ভে, একটিতে গ্রাফিক আর্টস এবং অন্যটিতে গ্লাস ও সিরামিক্স এ ডিপ্লোমা প্রদান করা হয় ।

সার্টিফিকেট কোর্স

সার্টিফিকেট পর্যায়

দেশের ৫১টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি ও হস্তশিল্পী গড়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেড এ দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স এসব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষার প্রশিক্ষণ কোর্স

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৎজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নিম্নোক্ত পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পর্যায়

১। ঢাকা টেকনিক্যাল টিসার্চ ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকবৃন্দের জন্য (ক) এক বছরের শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা এবং (খ) দুই বছরের স্নাতক শিক্ষক ডিগ্রি কোর্স প্রদান করা হয়।

২। বগুড়াস্থ Vocational Teache's Training Institute (VTTI) এ ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকবৃন্দের জন্য একবছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স এবং পরবর্তী এক বছরে ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন প্রদান করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউটে তিন পর্যায়ের (Three Level) প্রোগ্রাম রয়েছে। যেমন :

(১) কলেজ পর্যায় (কলেজ অব টেক্সাইল, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি)।

(২) পলিটেকনিক পর্যায় (পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট)।

(৩) ভোকেশনাল পর্যায় (৫১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট)।

এছাড়া ভোকেশনাল পর্যায়ে ১৯৯৫ সাল থেকে সাধারণ শিক্ষায় বেসরকারি স্কুলে এসএসসি (Vocational) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে ৪,৬৪০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে ১০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচ এস সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

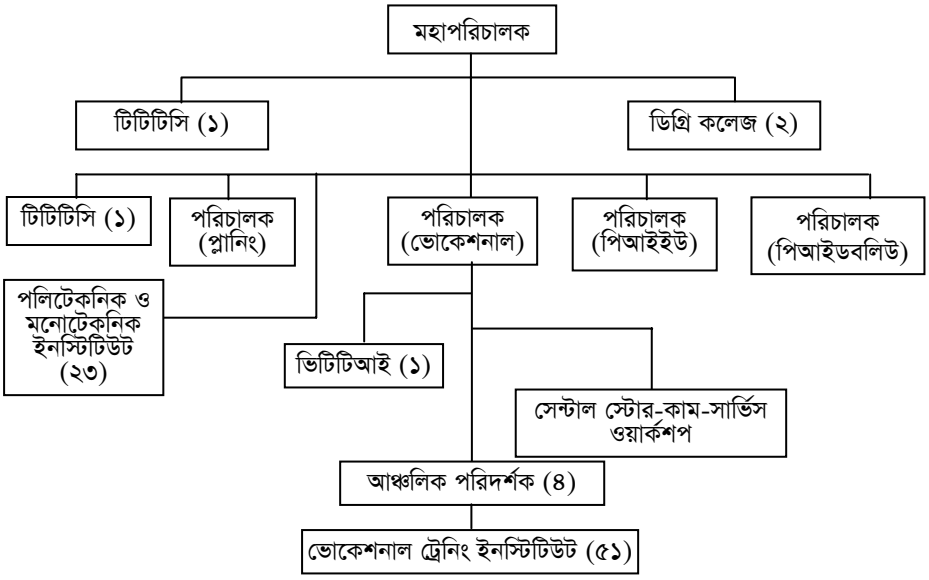

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

দেশের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা স্তরের ওপর ন্যস্ত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাধীনে গড়ে তুলতে হবে জনশক্তির একটি বিরাট অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে প্রতিকুল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মান বৃদ্ধির লক্ষে আমাদের অগণিত জনসম্পদকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে নতুন নতুন চাহিদার নিরীখে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি অধিদপ্তর। কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু কার্যকর ও সফলভাবে নিস্পন্নকরণের জন্য এই অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যে সহায়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্যে রয়েছেন পাঁচজন পরিচালক। যেমন- (১) পরিচালক (প্রশাসন); (২) পরিচালক (প্লানিং); (৩) পরিচালক (ভোকেশনাল); (৪)– পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) এবং (৫) পরিচালক (প্রোগ্রামস ইন্সপেকশন উইং)।

এছাড়া মহাপরিচালকের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য রয়েছেন (১) টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও অনুষদ শিক্ষকবৃন্দ এবং (২) কলেজ অব টেক্সাইল ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজির অধ্যক্ষদ্বয় ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা পরবর্তী পাঠগুলোতে আলোচনা করা হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৫০ সালে এদেশে কারিগরি শিক্ষায় কি কি প্রতিষ্ঠান ছিল?

২. কখন এদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়?

৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ডিগ্রি পর্যায়ের কয়টি কলেজ আছে এবং কি কি?

৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন ।

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখ করুন ।

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা বিবৃত করুন ।

পাঠ-৭.২ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি দায়িত্ব ও কর্তব্য ও ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্য-পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়-দায়িত্বের প্রধান প্রধান দিক বিবৃত করতে পারবেন;
- ► মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনায় কি কি ক্ষমতা বিধিবদ্ধভাবে প্রদানকৃত সেগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ► বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি উল্লেখ করতে পারবেন ।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্যপরিধি

মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্যপরিধি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি অধিদপ্তরের অফিস থেকে শুরু করে গৃহীত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বিস্তৃত । নিম্নে মহাপরিচালকের কার্যপরিধির প্রধান ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল:

১. কলেজ পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা;
২. ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষা;
৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
৪. সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), ভোকেশনাল শিক্ষা;
৫. হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ভোকেশনাল শিক্ষা;
৬. বেসিক ট্রেড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা;
৭. টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (ক) ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং (খ) বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন;
৮. ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (ক) সার্টিফিকেট ও (খ) ডিপ্লোমা শিক্ষা;
৯. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ;
১০. শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ;
১১. শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
১২. অধিদপ্তরের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
১৩. বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও কলেজের যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
১৪. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন;
১৫. মহাপরিচালকের অফিসের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা;
১৬. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনা;
১৭. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থানা এবং
১৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ।

কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব-কর্তব্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. দেশের কারিগরি শিক্ষা সংগঠন ও উন্নয়নে সরকারের পরামর্শ দাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৩. কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সরকারের নীতি বাস্তবায়নে নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪. অধিদপ্তরের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন;
৫. কারিগরি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দের চাকুরীতে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রণয়নকরণ;
৬. অধিদপ্তরের পধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৭. সরকারি আদেশ নির্দেশ ও নীতি বাস্তবায়নে অধ:স্তন অফিসে নির্বাহী আদেশ জারিকরণের দায়িত্ব পালন;
৮. অধিদপ্তরের সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা;
৯. বাৎসরিক পরিদর্শন ব্যতীত প্রতিমাসে একবার অধিদপ্তর, প্রতি তিন মাসে একবার মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন করা;
১০. অধিদপ্তর ও বিভাগের নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা;
১১. অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন ও গ্রাচুয়িটি মঞ্জুর করা;
১২. সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত দায়িত্ব পালন করা এবং
১৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা এবং প্রতিনিধিত্ব করার উপযোগী অফিসার মনোনয়ন প্রদান করা ।

মহাপরিচালকের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক নিয়মিত দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়াও কতগুলো ক্ষমতা বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করে থাকেন । যেমন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট পরিচালকবৃন্দ পেশ করেন মহাপরিচালক তাঁর বিধিবদ্ধ ক্ষমতা বলে সেগুলো মীমাংসা করে থাকেন । মহাপরিচালকের এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়গুলো হল:

১. সকল পলিসি সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইস্যু;
২. বড় ধরনের আর্থিক বিষয়গুলো;
৩. আইন শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা; যেমন-সাসপেনশন, চাকুরী থেকে বহিষ্কার, চাকুরি বিধি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত;
৪. চীফ ইনস্ট্রাক্টরসহ তদোর্ধ্ব পদে বদলি;
৫. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরর অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদোন্নতি;
৬. চতুর্থ শ্রেণী ব্যতীত অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলি;
৭. প্রেষণ ও ফোর্স ওয়েটিং সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;
৮. বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
৯. সকল পরিচালক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ACR প্রদান;
১০. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সকর প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
১১. অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ, চীফ ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দের ACR প্রতিস্বাক্ষরকরণ;
১২. অধিদপ্তরের অধীন সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার LPR, GPF ও পেনশন প্রদানের চূড়ান্ত অনুমোদন দান;
১৩. বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আগত সকল কর্মকর্তার পদায়ন করা;
১৪. দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তদোর্ধ্ব সকল কর্মকর্তার শিক্ষাজনিত ছুটি প্রদান;
১৫. যে সকল বিষয় পরিচালকবৃন্দ মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান ।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

- কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র/ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তি প্রদান প্রকল্পের অধীনে বুয়েট, বিআইটিসহ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৫০০ টি নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম বর্ষে ৩০,০০০ জন ছাত্রের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ।
- দেশের প্রতিটি থানায় নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৫০০টি নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম বর্ষে ৩০,০০০ জন ছাত্রের ভর্তির সুযোগ ।
- এসএসসি ও এইচ সি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিটিআইসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে ১ম বর্ষে ৫,৬৬০ জন এবং এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সে ১ম বর্ষে ৫,৬৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ।
- কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজির সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিককরণ এবং ৪টি বিভাগ চালুকরণ প্রকল্পের অধীনে কলেজ অব টেক্সাইল টেকনোলজির সংস্কার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের পাশাপাশি ইয়ার্ণ ম্যানুফ্যাকচার, ফেব্রিক্স মানুফ্যাকচার, ওয়েস্ট প্রসেসিং ও গার্মেন্টস টেকনোলজি বিষয়ে ৪টি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা ৬০টির স্থলে ১৬০টি আসন সৃষ্টি ।
- বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির সংস্কার, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম বর্ষে ছাত্র ভর্তির আসন সংখ্যা ৩০টির স্থলে বাড়িয়ে ৬০টি করা ।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রমের পাঠ্য বিষয়ে বাংলা পুস্তক প্রণয়ন প্রকল্পের অধীনে কারিগরি শিক্ষা সহজ করার জন্য ৬৩০টি বিষয়ে বাংলায় পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করা ।
- এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের অধীনে ভোকেশনাল কোর্সে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণের উপৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২,১৬,০৭৩টি উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ।
- বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আধুনিকীকরণ ও ১৫টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (শরীয়তপুর, ঠাকুরগাও, নওগাঁ, মাগুরা, শেরপুর, ব্রাহ্মবাড়িয়া, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, লক্ষীপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, ভোলা ও হবিগঞ্জ-এ) স্থাপন প্রকল্পের অধীন নতুন ও যুগোপযোগী টেকনোলজিসমূহ, যথা- আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন, কম্পিউটার, ইলেকট্রানিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি টেকনোলজি প্রবর্তনপূর্বক ডিপ্লোমা প্রদানের ব্যবস্থাসহ ১ম বর্ষে আরো ৩,৪৮০টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ।
- বিভাগীয় সদরে ৫টি নতুন মহিলা পলিটেকনিকট ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপ্লোমা কোর্সে ৪৮০টি আসন বৃদ্ধি করা ।
- বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটের সংস্কার, পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের অধীনে ইনস্টিটিউটের সংস্কারসহ সার্ভে ডিপ্লোমাতে ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০ জন করা ।
- বাংলাদেশ গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউটের সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের অধীনে ডিপ্লোমা (গ্লাস) কোর্স প্রবর্তন করে ১ম বর্ষে আরও ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা ।
- একটি নতুন ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই) স্থাপন এবং

বিদ্যমান ভিটিটিআই এর সংস্কার, নবায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতি বছর ২১০ জন করা হবে।

- খুলনা বিভাগে ১টি নতুন টেক্সাইল কলেজ স্থাপন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিগ্রি পর্যায়ের ১টি টেক্সাইল কলেজ স্থাপন করা হবে এবং ১ম বর্ষে আসন হবে ৬০ জন।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স প্রবর্তন প্রকল্পের অধীনে ২০০টি কলেজে মোট ৮,০০০ টি আসনে সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, কম্পিউটার অপারেশন, ব্যাংকিং, একাউন্টিং ও এন্টারপ্রেন্টিওরশীপ বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম কী কী?
২. বিএসসি টেকনিক্যাল এডুকেশন কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে তা বিবৃত করুন।
৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানকৃত বৃত্তি ব্যবস্থা ও সংখ্যা উল্লেখ করুন।
৪. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নতুন কয়টি পলিটেকনিক কোথায় কোথায় স্থাপন করবে?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহাপরিচালকের কার্যাপরিধি আলোচনা করুন।
২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা বিবৃত করুন।
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য বর্তমানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করুন।

পাঠ-৭.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্ল্যানিং ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► পরিচালক প্রশাসনের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ► পরিচালক প্ল্যানিং এর দায়িত্ব কর্তব্যের বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ► পরিচালক প্ল্যানিং এর বিধিবদ্ধ ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন ।

পরিচালক প্রশাসন

দায়িত্ব-কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কাজ প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা;
৩. প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দাখলকৃত বিভিন্ন কেইস পরীক্ষা নিরীক্ষা করা;
৪. অধিদপ্তরের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৫. মহাপরিচালককে অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
৬. দেশের কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সরকারি নীতি বাস্তবায়নে মহাপরিচালককে সহায়তা দান করা;
৭. প্রশাসনিক কর্মকর্তার সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা ।
৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী সম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণ বিষয়ে মহাপরিচালককে পরামর্শ প্রদান করা;
৯. নন-গেজেটেড শিক্ষক কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর করা;
১০. মহাপরিচালকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
১১. সহকারী পরিচালক (কলেজ ও মনোটেকনিক), সহকারী পরিচালক (পলিটেকনিক) সহকারী পরিচালক (শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং
১২. মহাপরিচালক কর্তৃক যখন যে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তা পালন করা ।

পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব-কর্তৃব্য

দায়িত্ব-কর্তব্য

১. প্ল্যানিং ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. প্ল্যানিং ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৩. প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্পের PCP ও মুল প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করণ;
৪. অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্কীম তত্ত্বাবধান;
৫. সহকারী পরিচালক (যন্ত্রপাতি) এবং প্রজেক্ট অফিসারের দায়িত্ব-কর্তব্য তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা;
৬. কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে বৈদেশিক ও বহি:সম্পদ প্রাপ্তি অনুসন্ধান এবং প্রাপ্ত সুযোগ ও সুবিধার যথাযত ব্যবহার নিশ্চিত রা;
৭. উন্নয়ন কার্যক্রম (ঝপযবসব) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
৮. গৃহীত প্রকল্পের সাময়িক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং
৯. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর কার্যাদি সম্পাদন করা;

বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব ও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিচালক তার অধীনস্থ কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর অফিসারবৃন্ধের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর;
২. প্রতিষ্ঠান প্রদান ব্যতীত সকল কর্মকর্তার ছুটির মঞ্জুরী প্রদান;
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার জিপিএফ ঋণের বরাদ্দ করা;
৪. প্রথম শ্রেণীসহ চীফ ইনস্ট্রাক্টর পর্যন্ত সকল শিক্ষকের বদলি;
৫. অন্যান্য অফিসের প্রশাসনিক ও অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান;
৬. শিক্ষকবৃন্দের বেনিফিট কেইস মীমাংসা করা;
৭. দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রথম শ্রেণীর অফিসারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা;
৮. আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষক/কর্মকর্তার বদলির আদেশ প্রদান করা;
৯. দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ দান;
১০. সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক/ইকুইপমেন্ট অফিসারে ACR এবং CR প্রদানের ব্যবস্থা;
১১. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য অফিসার ও স্টাফদের ACR প্রতিস্বাক্ষর করা;
১২. অফিস প্রধান ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দের ভ্রমণ কার্যাদি অনুমোদন এবং ভ্রমণ বিল প্রতিস্বাক্ষর করা;
১৩. চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও তার সমমানের অফিসারবৃন্দের ACR সংরক্ষণ করা;
১৪. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর LPR এবং GPF এর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা এবং
১৫. নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

অ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব-কর্তব্য বিবৃত করুন ।
২. পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব-কর্তব্য কী কী?
৩. পরিচালকদ্বয়ের ক্ষমতা উল্লেখ করুন ।

পাঠ-৭.৪ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোকেশনাল শিক্ষা) পরিচালক (পিআইইউ) ও পরিচালক (পিআইডব্লিউ)-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ► পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ► পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন;
- ► পরিচালক পিআইইউ-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ► পরিচালক পিআইডব্লিউ-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা বর্ণনা করতে পারবেন;

পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. কারিগরি অধিদপ্তরের বৃত্তিমূলক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. বৃত্তিমূলক বিভাগের সহকারী পরিচালক, প্রকল্প অফিসার, ইকুইপমেন্ট অফিসার, মার্কেটিং অফিসারের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা;
৩. বৃত্তিমূলক বিভাগের সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত কেইসগুলো নিরীক্ষা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪. শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৫. মহাপরিচালককে অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
৬. কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক সরকারি নীতি বাস্তবায়নে মহাপরিচালককে সহায়তা করা;
৭. বাজেট অনুমোদন এবং বিতরণ বিভাগের ও বিভিন্ন ইনস্টিউটিটের অফিসারের কার্যাদি তদারক ও সমন্বয়সাধন করা;
৮. ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কার্যাদি মূল্যায়ন ও গুণগত মান উন্নতির ব্যবস্থা করা ।
৯. বিভাগের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব তৈরি করা;
১০. বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সার্বিক উন্নয়নের বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে পরামর্শ দান এবং
১১. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা ।

পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষমতা

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিচালক, তাঁর অধীনস্থ কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর অফিসারবৃন্ধের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর;
২. প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যতীত সকল কর্মকর্তার ছুটি মঞ্জুরী প্রদান;
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার জিপিএফ ঋণের বরাদ্দ করা;
৪. প্রথম শ্রেণীসহ চীফ ইনস্ট্রাক্টর পর্যন্ত সকল শিক্ষকের বদলি;
৫. অন্যান্য অফিসের প্রধান প্রশাসনিক ও অর্থ বরাদ্দ অনুমোদন প্রদান;
৬. শিক্ষকবৃন্দের বেনিফিট কেইস নিস্পত্তি করা;
৭. দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রথম শ্রেণীর অফিসারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা;
৮. আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষক/কর্মকর্তার বদলির আদেশ প্রদান করা;
৯. দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ দান করা;
১০. সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক/ইকুইপমেন্ট অফিসারে ACR এবং CR প্রদানের ব্যবস্থা;
১১. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য অফিসার ও স্টাফদের ACR প্রতিস্বাক্ষর করা;

১২. অফিস প্রধান ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দের ভ্রমণ কার্যাদি অনুমোদন এবং ভ্রমণ বিল প্রতিস্বাক্ষর করা;
১৩. চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও তার সমমানের অফিসারবৃন্দের ACR সংরক্ষণ করা;
১৪. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর LPR এবং GPF এর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা এবং
১৫. নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ।

দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

পরিচালক প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) এর কার্যাবলি ও ক্ষমতা

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন;
২. প্রকল্পসমূহের টাইম সিডিউল ভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা অবহিত করা;
৩. সকল প্রকল্পের Trial-run স্তর থেকে শুরু করে কার্যাদির Consolidate করা;
৪. প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সকল প্রকল্পের কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় যোগান নিশ্চিত করা;
৫. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রেরণ;
৬. প্রকল্পের উন্নয়ন পর্যায় থেকে রেভিনিউ তে স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং
৭. প্রকল্প গ্রহণ পর্যায় থেকে শুরু করে সমাপ্ত পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের কার্যাদিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সকল ধরনের কার্যাদির জবাবদিহিতার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তিনি ডিজি-র অনুমোদনক্রমে প্রয়োগ করতে পারেন ।

পরিচালক প্রোগ্রাম ইন্সপেকশান উইং (পিআইডব্লিউ)-এর কার্যাবলি ও ক্ষমতা

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম যেমন, (১) বিএসসিইন ট্রেক্সাইল টেকনোলজি, বিএসসিইন লেদার টেকনোলজি, ব্যাচেলর অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং, ডিপ্লোমা অব টেকনিক্যাল এডুকেশন ও (৩) সার্টিফিকেট ইন টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন-এর যাবতীয় তদারক করা;
২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল প্রোগ্রামের অগ্রগতির ধারবাহিকতা ঠিক রাখার প্রয়োজনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা;
৩. প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
৪. ধারাবাহিক পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকরণ, প্রতিবেদন/সুপারিশ বিস্তরণ করা ও সকল প্রোগ্রামের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় এবং তা করলে কী কী সুবিধা হবে তা উল্লেখ করা এবং
৫. প্রোগ্রামের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অগ্রগতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাতে প্রোগ্রাম বিনা বাধায় লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিচালক ভোকেশনাল এর প্রধান পাঁচটি দায়িত্ব-কর্তব্য লিখুন
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নে বগুড়াস্থ VTTI-এর ভূমিকা বিবৃত করুন
৩. পরিচালক ভোকেশানাল এর প্রধান প্রধান ক্ষমতা কী?
৪. পরিচালক পিআইইউ এবং পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির তুলনামূলক বিবরণ দিন।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক ভোকেশনালের কার্যাবলি ও ক্ষমতা আলোচনা করুন।
২. পরিচালক পিআইইউ ও পরিচালক পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির মধ্যে পার্থক্য কী কী?
৩. পরিচালক প্রশাসন ও পরিচালক পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির মধ্যে কী কী সাদৃশ্য রয়েছে তা উল্লেখ করুন।
৪. পরিচালক পিআইইউ এবং পিআইডব্লিউ এর ক্ষমতা কী কী?

পাঠ-৭.৫

ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কলেজের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- কলেজের সহযোগী এবং সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের দায়িত্ব কর্তব্য বিবৃত করতে পারবেন;
- পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও উপাধাক্ষের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ডিগ্রি কলেজ/পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন ।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যক্ষ ডিগ্রি কলেজ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. কলেজের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. কলেজ সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতি বাস্তবায়ন;
৩. কলেজের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪. কলেজের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৫. কলেজের দৈনিক শিক্ষা কার্যাদি সম্পাদনের জন্য শিখন শেখানো উপকরণ ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করা;
৬. কলেজের একাডেমিক বিষয়ে প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন;
৭. কলেজের যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা ও অন্যান্য সম্পদ মেরামতের ব্যবস্থা করা;
৮. দালান কোঠা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা;
৯. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ বাস্তবায়ন করা;
১০. নিরীক্ষার আপত্তি মেটানোর ব্যবস্থা করা;
১১. অন্যান্য সংস্থায় কলেজের প্রতিনিধিত্ব করা এবং
১২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা ।

প্রফেসর ডিগ্রি কলেজ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের তদারক করা;
৩. বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষকের কার্য বণ্টনের দায়িত্ব পালন করা;
৪. বিভাগে একাডেমিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং শিক্ষাদান করা;
৫. বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের পমরার্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং
৬. বিভাগের ওয়ার্কশপের ও ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি স্থাপনের এবং রক্ষণাবেক্ষণের কার্যাদি তত্ত্বাবধানে করা ।

সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান;
২. পাঠদানের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, ওয়ার্কশপ ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা করা;

৩. বিভাগের ছাত্রদের পাঠ অগ্রগতি পরিমাণের জন্য নানা প্রকার অভীক্ষা প্রণয়ন করা;
৪. ছাত্রনিবাসের সুষ্ঠু পরিচালনার কার্যাদি তদারক করা;
৫. প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত কার্যাদি যেমন বার্ষিক ক্রীড়া, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সহায়তা করা এবং
৬. অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদানকৃত দায়িত্ব পালন করা ।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সরকারি নীতি বাস্তবায়ন;
৩. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান;
৪. ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
৫. অধ্যক্ষের অধীনের প্রদানকৃত তহবিলের আয়ন ব্যয়ন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৬. ইনস্টিটিউটের দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা;
৭. ইনস্টিটিউটের ও পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
৮. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশ ও নির্দেশনা ইনস্টিটিউটে বাস্তবায়ন;
৯. অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা এবং প্রয়োজনে ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিত্ব করা;
১০. ইনস্টিউটের পৌন:পুনিক বাজেট প্রণয়ন এবং
১১. অধিদপ্তরের প্রধান কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ।

পলিটেকনিক ইনস্টিউটের উপাধ্যক্ষ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. ইনস্টিটিউটের একাডেমিক হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিভিন্ন একাডেমিক কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা;
৩. সকল অভ্যন্তরীণ বহি: এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার আয়োজন করা ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট একাডেমিক কার্যাদি পালন;
৪. পাঠসামগ্রী প্রণয়নের কার্যাদি তত্ত্বাবধান করা;
৫. দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যাদিতে অধ্যক্ষকে সহায়তা করা;
৬. ইনস্টিটিউটের আবাসন বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৭. অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন এবং
৮. ইনস্টিটিউটের বার্ষিক পরিকল্পনা, ক্লাস রুটিন, একাডেমিক ক্যালেণ্ডার প্রণয়নের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সহায়তা দান করা ।

ডিগ্রি কলেজের এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এর ক্ষমতা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামগ্রীক কার্য পরিচালনায় উভয় অধ্যক্ষের ক্ষমতা একই সাথে Delegation of authority among officers under the directorate of Technical Education Bangladesh এ উল্লেখ করা হয়েছে । নিচে অধ্যক্ষের ক্ষমতা বিবৃত করা হল ঃ

১. সরকারি সংবিধি মোতাবেক বরাদ্দকৃত এমএলএসএস ও পৌনঃপুনিক খাত থেকে মিনিমাম স্টাফের নিয়োগদান;
২. আইন নিয়ম/বিধি এবং সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের প্রশাসন পরিচালনা করা;
৩. ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও স্টাফদের Excutive and operational গাইডেন্স প্রদান;
৪. অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা;

৫. প্রচলিত সরকারি বিধি মোতাবেক সকল ডিসিপ্লিনারী সমস্যা মীমাংসা করা;
৬. শিক্ষক ব্যতীত সকল কর্মচারীর অর্জিত মেডিক্যাল ও কোয়ার্নটাইন ছুটি অনুমোদন করা;
৭. কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ডিসিপ্লিনারী কেইজগুলো প্রক্রিয়াজাত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেরণ;
৮. সরকারি সম্পদ রক্ষা করা এবং যে যে সম্ভাব্য খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা যায় তা নিশ্চিত করা ।
৯. চীফ ইনস্ট্রাক্টর, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, এবং অধ্যাপকবৃন্দের ACR লেখা এবং অন্যান্য গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মকর্তা ও স্টাফদের ACR প্রতিস্বাক্ষর দান;
১০. সরকারি বিধি মোতাবেক কলেজ/ইনস্টিউটের আয়ন-ব্যয়ন অফিসারের দায়িত্ব পালন এবং সরকারি আদেশ বলে যেসব অধীনস্থ অফিসার আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাদের কাজ তদারক করা;
১১. তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের 'দক্ষতা সীমা' (Effeciency-bar) উত্তরণের অনুমতি প্রদান;
১২. সকল অধীনস্থ অফিসার ও কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা বিল পাস করা;
১৩. সকল কর্মকর্তা শিক্ষক ও কর্মচারীকে প্রথম জিপি ফাণ্ড থেকে অগ্রিম উত্তোলনের অনুমতি প্রদান এবং
১৪. সকল কর্মচারীর পেনসন ও গ্র্যাচুইটির চূড়ান্ত বিলে স্বাক্ষর দান ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের কয়েকটি একাডেমিক কর্তব্য উল্লেখ করুন ।
২. প্রফেসরের প্রধান কাজ কী কী?
৩. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের প্রশাসনিক কাজ কী কী?
৪. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষের একাডেমিক কার্যাদি লিখুন ।
৫. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও পলিটেকনিকট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের ক্ষমতার মধ্যে কী কী পার্থক্য আপনি উপলব্ধি করেছেন তা লিখুন ।

ইউনিট ৮

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
[Bangladesh Technical Education Board]

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ধারায় সাতটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদানের জন্য "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" নামে একটি বোর্ড রয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৯৬৭ সালের এক সংসদীয় এ্যাকট অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এটি কারিগরি শিক্ষার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত যাবতীয় সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। এছাড়া একই এ্যাক্টের বলে এই শিক্ষা বোর্ড তার আওতাভুক্ত সকল কোর্সের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন/নবায়ন, বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের প্রমাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী করিগরি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা।

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়নাধীন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণই করে না, সে সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যেমন জনশক্তি, বন, কৃষি, এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহের কারিগরি শিখ্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদও প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৩৩৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং বর্তমানে ৪৬টি শিক্ষা ক্ষেত্রে সনদ প্রদান করছে।

উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বোর্ড নানা বিষয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করছে।

পাঠ-৮.১ ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ-৮.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক পটভূমি বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যবলীর বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ব্যবস্থাপনা (নীতিমালা) বর্ণনা করতে পারবেন ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির সময় এদেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। সে কারণে তখন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনবলের বড়ই অভাব ছিল। এই অবস্থার আশু উত্তরণের জন্য এবং দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫৪ সালে "The East Pakistan Board of Examination for Technical Education" তৎকালীন বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের অধীনে সরকারি নির্বাহী আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব ছিল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা পরিচালনা এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা ।

১৯৬০ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ সালে সরকার কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। দেশের কারিগরি শিক্ষার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও ট্রেড পর্যায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এই অধিদপ্তর কাজ শুরু করে। এর ফলে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। এসব একাডেমিক কাজ সুষ্ঠু ও দ্রুত সম্পন্নকরণের জন্য একটি বিধিবদ্ধ বোর্ড (Statory Board) স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালের কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক 'এক নম্বর' সংসদীয় আইন বলে "The East Pakistan Technical Education Board " শিরোনামে Statutory Board প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে Banladesh Technical Education Board (BTEB) নামে পরিচিত ।

এই বোর্ড সমগ্র দেশের কারিগরি শিক্ষার সংগঠন, তত্ত্বাবধান, বিধিবদ্ধকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের কাজ শুরু থেকে অদ্যাবধি করে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের গঠন কাঠামো

বোর্ডের পরিচালনা কাঠামো

বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক। এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রকের পদমর্যাদা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুরূপ ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালনার জন্য একটি গঠন কাঠামো রয়েছে। এই গঠন কাঠামো নিম্নরূপ :

চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী। বোর্ডের সমুদয় পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের ।

পদাধিকার বলে সদস্য

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পরিষদের সদস্যবৃন্দ দুই প্রকার (১) পদাধিকার বলে সদস্য এবং (২) মনোনীত সদস্য।

- মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ঢাকা

মনোনীত সদস্য

- অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
- ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (বর্তমান বিলুপ্ত) হতে মনোনীত একজন প্রতিনিধি
- প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অথবা তাঁর মনোনীত একজন অধ্যাপক
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত পলিটেকনিকট এবং মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটের তিনজন অধ্যক্ষ
- নিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহী চারজান সদস্য

সংসদীয় আইন অনুযায়ী বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ

বোর্ডের কার্যাবলি

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
- কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান বা প্রত্যাহারকরণ;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নীমিালা প্রণয়ন এবং একই শিক্ষাক্রমের ছাত্রছাত্রীর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বদলির শর্তাবলি নির্ধারণ;
- কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের নীতিমালা প্রণয়ন;
- বোর্ডের কর্মকর্তা বা অপর কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;
- কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম সমাপনকারী প্রার্থীবৃন্দের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ;
- পরীক্ষা উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গকে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট প্রদান;
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কাগিরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির মতানৈক্য/মতবিরোধজনিত পরিস্থিতির নিস্পত্তিকরণ;
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সমীপে বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মতামত পেশকরণ;
- সংসদীয় আইনের অনুবিধি মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সংখ্যা, পদবী ও বেতনভাতাদি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক নিয়ন্ত্রণ;
- পদসৃষ্টি ও পদ বিলুপ্তিসহ সকল প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ;
- প্রবিধানে উল্লিখিত বোর্ডের যাবতীয় পাওনা নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থাকরণ;
- আইনের বিধান অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতানুসারে সংশ্লিষ্ট কোন কাজ সম্পাদননের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া;
- বোর্ডের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভবন, চত্তর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণ সংস্থানকরণ এবং
- কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এর মান উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা তিনটি বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সংসদীয় আইন অনুযায়ী কার্যাদি পরিচালনা করা হয়ে থাকে এই বোর্ডের বর্তমানে জনবল ৯২ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী ১৬ জন দ্বিতীয় ৮ জন, তৃতীয়

শ্রেণী ৪৫ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী ২৩ জন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ছক নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামো

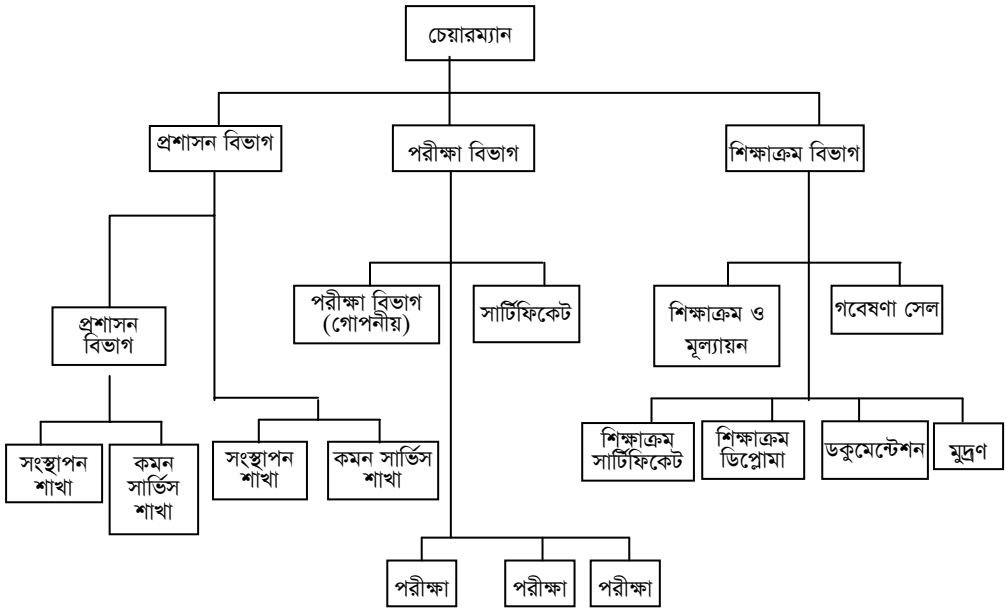

প্রশাসন বিভাগ

সচিব প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা। তিনি বোর্ডে আয়ন-ব্যয়ন এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক বিষয়াদি পারন করেন। কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগদান, ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলি, বাজেট প্রণয়ন ও পেশকরণ, আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণপূর্বক বোর্ডের তহবিল সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের কাগজ পত্রাদি তৈরি এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ এবং কোন কোন সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন।

শিক্ষাক্রম বিভাগ

কারিকুলাম বিভাগের প্রধান একজন পরিচালক। বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত সকল শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন, উন্নয়ন, পরিমার্জন, নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, সম্পাদনাকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও মূল্যায়ন এইসব কাজ পরিচালক শিক্ষাক্রম এর সম্পাদনকাকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও মূল্যায়ন এইসব কাজ পরিচালক শিক্ষাক্রম এর দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশে ও বিদেশে যেসব নবতর দিক সমকালে উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

পরীক্ষা বিভাগ

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি বোর্ডের আওতাধীন সকল অনুমোদিত শিক্ষাক্রমসমূহের পরীক্ষা নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ, প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও উত্তরপত্র পরীক্ষক নির্বাচন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ এবং যথাসময়ে কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পর ন্যস্ত। তাছাড়া উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, ফল সংকলন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনশৃংখলা বিধি প্রয়োগ, ফলাফল ঘোষণা নম্বরপত্র/সনদপত্র তৈরি ও বিতরণ এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত দলিলাদির সংরক্ষণও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কোর্সসমূহ

১.	ডিপ্লোমা টেকনিক্যাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদী
২.	ডিপ্লোমা ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদী
৩.	সার্টিফিকেট ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদী
৪.	সার্টিফিকেট ভোকেশনাল এডুকেশন (উপানুষ্ঠানিক)	১ বছর মেয়াদী
৫.	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদী
৬.	ডিপ্লোমা প্রিন্টিং	৩ বছর মেয়াদী
৭.	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (সিরামিক/গ্লাস)	৩ বছর মেয়াদী
৮.	ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রি	৩ বছর মেয়াদী
৯.	ডিপ্লোমা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদী
১০.	ডিপ্লোমা এগ্রিকালচার	৩ বছর মেয়াদী
১১.	ডিপ্লোমা টেক্সটাইল	৩ বছর মেয়াদী
১২.	ডিপ্লোমা সার্ভে	৩ বছর মেয়াদী
১৩.	সার্টিফিকেট সার্ভে ফাইনাল	৩ বছর মেয়াদী
১৪.	সার্টিফিকেট আমিনশিপ	৩ বছর মেয়াদী
১৫.	এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	৩ বছর মেয়াদী
১৬.	ডিপ্লোমা কমার্স	৩ বছর মেয়াদী
১৭.	এইচএসসি (ভোকেশনাল)	৩ বছর মেয়াদী
১৮.	এসএসসি (ভোকেশনাল)	৩ বছর মেয়াদী
১৯.	জাতীয় দক্ষতায়ন-২	১ বছর মেয়াদী
২০.	জাতীয় দক্ষতায়ন-৩	১ বছর মেয়াদী
২১.	জাতীয় দক্ষতামান বেসিক	৩৬০ ঘন্টা মেয়াদী
২২.	সার্টিফিকেট ফুটওয়ার মেকিং	১ বছর মেয়াদী
২৩.	সার্টিফিকেট লেদার ট্যানিং	১ বছর মেয়াদী
২৪.	সার্টিফিকেট সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স	১ বছর মেয়াদী
২৫.	ট্রেনিং বিজনেস টাইপিং	৬ মাস মেয়াদী
২৬.	বেসিক ট্রেড (মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্‌রাসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য)	৩৬০ ঘন্টা মেয়াদী

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কখন কিভাবে স্থাপিত হয়?
২. কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কতজন শ্রেণী বিভাগসহ উল্লেখ করুন ।
৩. কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জনবলসহ প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখ করুন ।
৪. কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগের নাম লিখুন ।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিচালনা কাঠামোর বিশদ বিবরণ দিন
২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কিরূপ তা আলোচনা করুন ।

ইউনিট ৯

জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭
[National Education Policy 1997]

ভূমিকা

একটি দেশের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় কল্যাণের অন্যতম হাতিয়ার এবং দক্ষ, কর্মদক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী কার্যকর শিক্ষানীতি। একটি দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি সমাগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। বর্তমান সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি (১৪-০১-৯৭ তারিখে) গঠন করা হয়। এই কমিটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতির দলিল সরকারের নিকট পেশ করে। এটি জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ নামে পরিচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি শিক্ষার ১৪টি জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। নিম্নে শিক্ষার এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্ববোধ, জাতীতাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানকি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়েতোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পারিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায়ন হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।
১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা
১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা অবারিত করা।
১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ বৈষম্য (Gender baias) দূর করা।
১৩. শিক্ষায় সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
১৪. পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এম এড কোর্স বইটি বাংলাদেশের প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে রচনা করা হয়েছে। এই বিবেচনায় বাংলাদেশের "জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭"-এ উল্লেখিত তিনটি শিক্ষা সম্পর্কে কী কী সুপারিশ রেখেছে সেগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে-যাতে একজন এম এড প্রশিক্ষণার্থী এই তিনটি শিক্ষা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

পাঠ-৯.১ : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমুহ

পাঠ-৯.২ : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ

পাঠ-৯.৩ : বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ

পাঠ-৯.১ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষানীতি কী বলেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ সম্বন্ধীয় সুপারিশগুলো বিবৃত করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করছে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি কোন শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করেচে তার প্রধান প্রধান দিক বর্ণনা করতে পারবেন ।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষানীতি কমিটির বক্তব্য

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত । দেশের মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ হল প্রাথমিক শিক্ষা । আজকের উন্নত দেশগুলো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সকল নাগরিকের ন্যূনতম শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করেছে। তাই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন অপরিহার্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত হয় । বিগত দুই যুগে গৃহীত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা অগগতি য়েছে। বর্তমানের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের ৯০ শতাংশের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৬০ শতাংশের মতো এই শিক্ষা সম্পুর্ন করে । ভৌত সুযোগ সুবিধার গুরুতর অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং প্রাথমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের কারণে বর্তমানে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় । সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তাতে শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তার ঘটলেও দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সেসব যথেষ্ট কার্যকর হয়নি ।

শিক্ষানীতি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালে জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে । কাজেই এই স্তরের শিক্ষা, যাকে আজকাল মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা বলে গণ্য করা হয় । তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের দেশে অনেককে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবন আরম্ভ করতে হয়, আবার অনেকে

পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। এই দুই ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষানীতি কমিটি নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে :

- প্রাথমিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাকে জীবনভর শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রাথমিক শিক্ষা সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলবে;
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে শিশুদের ব্যবহারিক সাক্ষরতা সুদৃঢ় করা। এই স্তরের শিক্ষাকালে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবেগিক-নৈতিক গঠন ও অর্থপূর্ণ কায়িক শ্রমের প্রস্তুতি গ্রহণের সহায়ক বিষয় শেখানো এবং
- প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। শিশুদের দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ কর্তব্যবোধ, কৌতুহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা এসব বাঞ্ছিত গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমানে চালু পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত জীবন ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সারা পৃথিবীতেই শিক্ষার্থীদেরে প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবন দক্ষতার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের এবং জীবনভর শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করার সুপারিশ করেছে। বুনিয়াদি শিক্ষার আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদও আট বছর করা প্রয়োজন; এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে শিক্ষক সংখ্যা বহুগুণে বাড়াতে হবে। প্রতি বিদ্যালয়ের একটা ছোটখাট গ্রন্থাগার থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে নিম্ন প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীকে উচ্চ প্রাথমিক স্তর নামকরণ করতে হবে;
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালে মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করতে হবে;
- বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি শ্রেণীকক্ষ আছে। ২০০০ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপেক্ষে পাঁচটি শ্রেণীকক্ষ নিশ্চিত করা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি শ্রেণীকক্ষ ও গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক কক্ষ যোগ করতে হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হবে দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, শিশুদের দেহ-মনের পুষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতি চেতানার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে থাকবে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম (জীবনচারণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ)। ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের বিষয় হবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বহুমুখী শিখন (গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি ইত্যাদি), ধর্ম, ললিত কলা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা।

ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশ

১৯৯১ সালে সরকারের একটি নির্বাহী আদেশে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ মনে করেন শিক্ষা জীবনের শুরুতে একজন শিশুকে দুটি ভাষা শেখালে শিশুর ওপর মানসিক চাপ পড়ে। এজন্য কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখানোর প্রস্তাব করেছিল। শিক্ষার বর্তমান অবস্থা শিক্ষকের প্রস্তুতি, গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষকের অভাব ও বর্তমান প্রেক্ষিত ইত্যাদি বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষা নীতি কমিটি ১৯৯৭ তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি প্রচলনের প্রস্তাব করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ

ক) শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদি বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে: পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে পারে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হলে শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা উচিত নিম্ন-প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ-প্রাথমিকের মধ্যে একটি দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক; তিন বছরের মধ্যে সিইনএড বা বিএড (প্রাইমারী) অর্জন করতে হবে।

খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রচলিত এক বছর মেয়াদী সিইনএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ নয় বলে অনেকে মনে করেন। এই কোর্স তাত্ত্বিক বিষয়ে ভারাক্রান্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বাস্তব শিক্ষকতার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসূচী অনুযায়ী যেসব মড্যুল সরবরাহ করা হয় তার বাইরে আর তেমন কোন পঠন সামগ্রী নেই। এতে তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ অতি সামান্য। এই কার্যক্রম বাস্তবমুখী করা প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণী-শিক্ষণ ও স্কুল পরিচালনার কাজের ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে বলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মানও যথাযথভাবে উন্নত করার প্রয়োজন হবে। এ অবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশ

- এইচ এসসি পাশ শিক্ষকদের জন্য এক বছর মেয়াদী সিইনএড প্রশিক্ষণ কোর্স এবং স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য এক বছর মেয়াদী বি এড (প্রাইমারী) কোর্স চালু করতে হবে এবং এসকল কোর্সে শিক্ষাদানে প্রায়োগিক বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে। কিছু সংখ্যক পিটিআইকে ডিগ্রি কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে মান উন্নয়ন করে দু'বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। বিএড প্রাইমারী কোর্স চালু করার জন্য কিছু সংখ্যক পিটিআইকে ডিগ্রি স্তরে উন্নীত করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য মড্যুলের পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক যথাযোগ্য মানের পাঠ্যবই প্রণয়ণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও গ্রন্থাগার উপযুক্ত বইপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ ভাতা দিতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য শুধু চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমাগত সঞ্জীবিত রাখার জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ১৯৮৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়। এই পদ্ধতি কিছু অসুবিধার জন্য পরবর্তীকালে এর পরিবর্তে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালূ হয়েছে। চার-পাঁচটি কাছাকাছি বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে একটি সাব-ক্লাস্টার গঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি দু'মাসে একদিন করে শিক্ষক তাঁর এলাকার এটিইওর কাছে বছরে মোট ছয় দিনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে-

- শিক্ষকদের নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন এটিইও নিয়োগ করে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ প্রশিক্ষক গড়ে তুলতে হবে।
- এটিইওদের জন্য যানবাহনসহ সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।
- কর্মকালীন প্রশিক্ষণে পিটিআই প্রশিক্ষকদেরকে সংশ্লিষ্ট করা এবং পরীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

ক) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

বর্তমানে (১) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (২) শিক্ষক অভিভাবক সমিতি এবং (৩) ওয়ার্ড কমিটি রয়েছে। এসব কমিটির পরিবর্তে শুধু একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে যার চেয়ারম্যান এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন। সমাজের সঙ্গে স্কুলের আন্ত:সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য শিক্ষক ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষায় আরও সম্পৃক্ত করতে হবে।

খ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

সরকারি, বেসরকারি, এনজিও ইত্যাদি স্কুলকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এনে প্রাথমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। জাতীয়করণের পর এগুলো পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা সরকারি অনুমোদন ও অনুদান পাওয়ার জন্য আবশ্যক হবে।

গ) বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সম্পৃক্ততা

বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বর্তমানে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই বিধায় কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অসন্তোষজনক। ফ্যাসিলিটিস বিভাগ ও এলজিআরডি-এর প্ল্যান অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্কুল কমিটির ওপর দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া (১) শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, (২) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, (৩) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সম্পদ বিনিয়োগ, (৪) প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সরকার ও জনগণকে অংশীদারিত্বের দায়িত্ব নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যালয়-৯.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি কখন গঠিত হয়? এই কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
২. জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি সামগ্রিক শিক্ষার জন্য কয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে?
৩. শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ কত বছর নির্ধারণ করেছে?
৪. প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কী কী গুণ অর্জনের কথা বলা হয়েছে?
৫. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে কিভাবে বিভক্তিকরণের কথা বলেছে?
৬. জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কী কী প্রস্তাব করেছে?
৭. বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকে সম্পৃক্তকরণে শিক্ষানীতি কমিটির পরামর্শ কী কী?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধ্যে শিক্ষানীতি কমিটির প্রস্তাব কী কী?
২. শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কী কী প্রস্তাব রাখে?
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশ কী কী?
৪. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষানীতি কমিটি কিছু নুতন দিক প্রস্তাব করে সেগুলো কী?

পাঠ-৯.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিবৃত করতে পারবেন;
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭' মাধ্যমিক শিক্ষার যেসব বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭' কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন;
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭' অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭' কর্তৃক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার সম্বন্ধীয় সুপারিশসমুহ উল্লেখ করতে পারবেন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি উপস্তর

মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনটি উপ-স্তরে বিভক্ত। যেমন-

- নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর : ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী নিয়ে গঠিত
- মাধ্যমিক স্তর : ৯ম ও ১০ম শ্রেণী নিয়ে গঠিত
- উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর : ১১শ ও ১২শ শ্রেণী নিয়ে গঠিত।

বর্তমানে দেশে নিম্নমাধ্যমিক ৩,০০২টি, মাধ্যমিক ১০,৬০৯টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ৯০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের মাসিক বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং আনুষঙ্গিক কিছু আর্থিক সুবিধা সরকার প্রদান করে থাকে। সরকার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পও গ্রহণ করে। এছাড়া পৌরসভার বাইরে গ্রামীণ মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহিত করার জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার যে অনুদান দিয়ে থাকে তা পর্যাপ্ত নয় এবং আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অপ্রতুলতাসহ প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর যথেষ্ট অভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব ইত্যাদি কারণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটছে না। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য আছে; বৈষম্য আছে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ল্যাবরেটরি স্কুল, শাহীন স্কুল, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেকাংশ বৈষম্যের কারণ হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন বলে সর্বত্র সমমানের শিক্ষা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া স্কুল, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য থাকায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার মানের ব্যাপারেও অসঙ্গতি বিরাজ করছে। স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হলে এসব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এই স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করবে, এখানকার অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে তাদের জীবন হয়ে উঠবে সাফল্যমণ্ডিত। ফলে তারা সমাজ ও দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সারধারণ শিক্ষার সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাই বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ছাড়পত্র বলে বিবেচিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের উপর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নির্ভরশীল। এই স্তরের শিক্ষা শেষে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় তাদের প্রবেশের সুযোগ ঘটবে। আর যারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপরের দিকে যেতে চাইবে না বা উপযুক্ত বিবেচিত হবেনা তারা এই স্তরে লব্ধ বৃত্তিমূলক বিষয়ে দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী জীবিকা অবলম্বন করতে পারবে। এ স্তরের মেধা ও প্রবণতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা উপযোগী ধারায় স্থানান্তরিত হতে পারবে। কাজেই এ স্তরের শিক্ষায় যেমন একদিকে থাকবে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন ধারার সমাহার আর অন্যদিকে থাকবে জীবন ও জীবিকা নির্ভর হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থা।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। সে কারেণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে যেন এই স্তরের শেষে একজন শিক্ষার্থী কর্মক্ষম সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীত কমিটি ১৯৯৭ নিম্নোক্ত মানদণ্ডের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান লাভ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে :

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা;
- উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা;
- শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরের প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা এবং
- শিক্ষার্থীকে মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানদান।

মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা

তিনটি ধারা :
১। সাধারণ শিক্ষা
২। বৃত্তিমূলক শিক্ষা
৩। মাদ্‌রাসা শিক্ষা

দেশের বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনধারা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ বয়সসীমা ১৪ থেকে ১৭ বছররের মধ্যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী নানা কারণে স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে এবং সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অথচ জীবিকার্জনে সহায়ক তেমন কোন প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য তারা দুর্বহ বোঝাস্বরূপ। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচিত। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই চারিটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি এ তিনটি ধারায় বিভক্ত। এ তিনটি ধারার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি

পূর্ণাঙ্গ ও বৈষম্যহীনতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের তিনটি ধারাও সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষার কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। আবার এই পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম এমন হতে হবে যাতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা অথবা উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা কোন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করে তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে জীবন ও জীবিকার মধ্যে সম্বয় সাধন করা সম্ভ হয়। তাছাড়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পারিক স্থানান্তর সহজ হয। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পারন করবে।

এম এড প্রোগ্রামের আবশ্যিক, "শিক্ষার ভিত্তি" কোর্সে এই তিনটি ধারা সম্বন্ধে আমরা জেনেছি এখানে পর্যালোচনার জন্য এই তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির আলোকে প্রদান করা হল :

নম্বর বণ্টন
আবশ্যিক-৬০০
নৈর্ব্যাক্তিক-৩০০
ঐচ্ছিক-১০০

সাধারণ শিক্ষা

১। মাধ্যমিক

মাধ্যমিক শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণীর জন্য অন্যতম বিভাগ সাধারণ বিভাগ। এর মধ্যে থাকবে বিজ্ঞান শাখা, মানবিক শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা।

১. বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় ৬০০ নম্বরের, তিনটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ৩০০ এবং একটি ১০০ নম্বরের নৈব্যক্তিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় থাকবে। এ ছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।
২. মানবিক শাখায় থাকবে আবশ্যিক বিষয় ৬০০ নম্বরের, তিনটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ৩০০ নম্বরের এবং একটি ১০০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় থাকবে। এছাড়া এ শাখায় আরও একটি ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।
৩. ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আবশ্যিক বিষয় ৬০০, তিনটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ৩০০ এবং একটি নৈর্ব্যক্তিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় ১০০। এছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা বিভাগের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয় ৪০০, নৈর্ব্যক্তিক বিষয় ৬০০ এবং প্রযুক্তি শিক্ষা ১০০, মোট ১১০০ নম্বর থাকবে। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বাংলা ২০০ এবং ইংরেজি ১০০, মোট ৩০০ নম্বর সবার জন্য নির্ধারিত থাকবে। বিজ্ঞান শাখা, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সঙ্গীত শাখায় স্বতন্ত্র আবশ্যিক, নৈর্ব্যক্তিক ও ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১। মাধ্যমিক

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিন ধারার মধ্যে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা' একটি পূর্ণাঙ্গ ধারা হিসেবে বিরাজ করবে। জনশক্তি হল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তি ও বজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের অফুরন্ত জনসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নবম দশম শ্রেণীতে থাকবে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান। এর মোট নম্বর ৬০০। এছাড়া থাকবে ৪টি অতিরিক্ত আবশ্যিক বিষয়। উচ্চতর গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও কম্পিউটার

শিক্ষায় মোট নম্বর ৪০০। এছাড়া নৈর্বাচনকি বিষয় হিসেবে একটি বৃত্তিমূলক ট্রেড ৩০০ ও সংশ্লিষ্ট ট্রেডে বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০০ নম্বর। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগে সর্বমোট নম্বর হবে ১৪০০। এই বিভাগে যেসব ট্রেড থাকবে তার শাখাগুলো এ রকম : ১) কৃষি উপশাখা, ২) ইঞ্জিনিয়ারিং উপশাখা ৩) তথ্য উপশাখা, ৪) সার্ভিস উপশাখা ৫) টেক্সাইল উপশাখা ও ৬) অন্যান্য বৃত্তি উপশাখা।

নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা বিভাগে আবশ্যিক ও নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের সঙ্গে একটি ১০০ নম্বরের প্রযুক্তি বিষয় নৈর্বাচনিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে। অপরদিকে মাধ্যমিক স্তরের মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগে একই ধরনের একটি ১০০ নম্বরের নৈর্বাচনিক আবশ্যিক বিষয় গ্রহণ করতে হবে। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে অনুরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা থাকবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগে সাধারণ আবশ্যিক বিষয় ৪০০, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ৭০০ এবং নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ ৫০০ নম্বর। বৃত্তিমূলক ট্রেড উপশাখা, কৃষি উপশাখা, ইঞ্জিনিয়ারিং উপশাখা, তথ্য উপশাখা, সার্ভিস উপশাখা, টেক্সাইল উপশাখা, অন্যান্য বৃত্তি উপশাখা, কারার ব্যবস্থাপনা উপশাখা, কম্পিউটার অপারেশন উপশাখা, বহুভাষিক সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স উপশাখা, হিসাবরক্ষণ উপশাখা ও উদ্যোগ উন্নয়ন উপশাখা ইত্যাদি উপশাখাগুলোতে সাধারণ আবশ্যিক বিষয়গুলো থাকবে সকল শিক্ষার্থীর জন্য, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ও নৈর্বাচনিক বিষয় বিশেষ বিশেষ শাখার জন্য থাকবে।

গ) মাদরাসা শিক্ষা

১। মাধ্যমিক

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগে নবম ও দশম শ্রেণী (দাখিল) পর্যায়ে থাকবে, বিজ্ঞান, মানবিক ও বৃত্তিমূলক শাখা। সকল শাখার জন্যই আবশ্যিক বিষয় ৬০০, অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ৩০০ এবং নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় ১০০। এছাড়া ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাখার জন্য সাধারণ আবশ্যিক বিষয় যেমন থাকবে, তেমনি বিশেষ বিশেষ শাখার জন্য স্বতন্ত্র আবশ্যিক বিষয় ও ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। সকল শাখায় একটি প্রযুক্তি বিষয় গ্রহণ করতে হবে।

২। উচ্চ মাধ্যমিক

একাদশ ও দ্বাদশ (আলিম) শ্রেণীতে থাকেব বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা। প্রত্যেক শাখায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয় থাকবে ৪০০ নম্বরের, শাখা ভিত্তিক অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়ে থাকবে ৬০০ নম্বর। এছাড়া ২০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাকমিটির সুপারিশ

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশসমূহ

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে চার বছরের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

২. সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

৩. মাধ্যমিক স্তর অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৪. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ

মাধ্যমিক কলেজগুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সকল বিষয়ে শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্যপদ পুরণের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৬. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বহন করতে হবে। সেই সঙ্গে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের একটি যুক্তিসঙ্গত হার নির্ধারণ করতে হবে এবং তা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

১০. শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য দু'জন উপাধক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।

১১. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

১৩. দশম শ্রেণীর পর একটি বহি:পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক পথম পর্ব। এই পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে আন্ত:পরীক্ষার ফলাফল করে চুড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহি:পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে আন্ত:পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চুড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৪০।

১৫. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

১৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

১৭. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. সরকারের নির্ধারিত স্তরের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারী, ট্রাস্ট ও দেশীবিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সরকারের শিক্ষাখাত থেকে অর্থ বরাদ্দ করা চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "ও" লেবেল এবং "এ" লেবেল চালু রাখতে পারে।

১৯. বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছেন। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় উপস্তরগুলো কী কী?
২. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী বৈষম্য রয়েছে?
৩. শিক্ষানীতি কমিটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কী কী প্রস্তাব রেখেছে?
৪. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষানীতি কমিটি কী বলেছে?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষানীতি কমিটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা লিখুন।
২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের শিক্ষানীতি কমিটি (১৯৯৭) কী কী সুপারিশ রেখেছেন তা বিবৃত করুন।

পাঠ-৯.৩ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশসমুহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দেশের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যেসব সুপারিশ প্রদান করেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
  -বৃত্তিমূলক শিক্ষা
  - কারিগরি শিক্ষা
  - শিক্ষক প্রশিক্ষণ
  - শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা
  - পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ
  - বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

গুরুত্ব

কোন দেশে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য। আর পেশাগত শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। সে কারণে দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তণ ঘটছে। উন্নয়শীল দেশগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রফতানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের অফূরন্ত জনসম্পদকে বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত একটি জরিপ থেকে দেখা যায় দক্ষ কাজে নিয়োজিত ৮৫%-৯৪% শ্রমিকের কোন প্রশিক্ষণ নেই, মধ্যস্তরে ৬৪% কারিগরি পদে নিয়োজিত সুপারভাইজারদেরও কোন প্রশিক্ষণ নেই। এ ছাড়া উচ্চস্তরে নিয়োজিত পেশাজীবীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে মধ্যস্তরে নিয়োজিত কারিগরি পেশাজীবীদের (টেকনিশিয়ান) চেয়ে বেশি। জব মার্কেট, এমপ্লয়েমেন্ট প্যাটার্ন উল্লিখিত এ তিন ধরনের নাজুক অবস্থা বিদ্যমান থাকায় কৃষি, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্য একটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বিদেশে ক্রমান্বয়ে অধিক হারে অদক্ষ জনশক্তি রফতানির ফলে এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার আয় দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।"

এ অবস্থা দেশের উৎপাদন শীলতা তথা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে মোটেও সহায়ক নয়। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষে কৃষি, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কাজে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানীর মাধমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা দরকার।

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭-এর সুপারিশসমূহ

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা সামনে রেখে যে সব সুপারিশ প্রদান করেছে সেগুলো হল :

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে ও মাদ্‌রাসা শিক্ষায় বৃত্তিমুলক শিক্ষা পর্যায়ক্রমের প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিল্পকারখানা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যাণ্ডইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসম্যান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক কোর্সের মাধ্যমিক পর্যায়ের কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে প্রকৌশল ডিপ্লোমাসহ সমপর্যায়ের অন্যান্য ডিপ্লোমা কোর্সের কমপক্ষে ২৫% আসনে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ইচ্ছুক উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কোর্সে কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া সাধারণ শিক্ষাসহ নিজ নিজ পর্যায়েও স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ ধারায় উচ্চ শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেখানে সম্ভব সেখানে দুই শিফট চালু করা হবে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেরামত, সংরক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের সুপারিশ

- ডিপ্লোমা স্তরের সকল কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে প্রচলিত তিন বছর প্রাতিষ্ঠানিক এবং দুই মাস শিল্পকারখানা/মাঠ পর্যায় সংযুক্তির স্থলে তিন বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস শিল্পকারখানা/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তি করতে হবে।
- এ শিক্ষাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ডিজাইন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, এপ্লাইড সায়েন্স, এনভায়রমেন্ট, সেরিকালচার, হর্টিকালচার লেদার, ড্রেসমেকিং, গার্মেন্টস, এগ্রিকালচার পোস্ট হারভেস্ট, টেক্সাইল এবং ক্লোদিং, প্রিন্টিং, গ্লাস, সিরামিক, মার্কেটিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ইন্সট্রমেন্ট, ইন্সট্রমেন্টেশন, মাইনিং, পেট্রোলিয়াম, সেলসম্যানশিপ, পশুপালন, মৎস্য, বনায়ন, রুরাল টেকনোলজি, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বহুমুখী ও সম্প্রসারণ করতে হবে।
  বিভিন্ন প্রকার ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পলিটেকনিক ও মনোটেকনিকগুলোকে পূর্ণাঙ্গ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করতে হবে।
- কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা কোর্সে (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের কোর্সের আসনের কিছু অংশ কারিগরি ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে।

- প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফ্‌টে চালু রাখতে হবে।
- পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে চার বছর মেয়াদী (তিন বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তি) পশুপালন, হার্টিকালচার, পশু চিকিৎসা ও মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেরামত, সংরক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজনের নিরিখে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা উত্তর স্বল্পমেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান্নোয়নে সুপারিশ

- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত শিক্ষক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে অধিকতর অবদান রাখেন এবং শিক্ষকতার বাইরের কর্মক্ষেত্রে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি যথেষ্ট আছে বলে তাঁদের বেতন সমমানের অন্যান্য পদের বেতনক্রমের পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে নির্ধারণ এবং টেকনিক্যাল পে, শিক্ষকতা ভাতা ও পদোন্নতির উপযুক্ত ব্যববস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকের স্বীয় পদ মানোন্নয়ন করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকতার সকল পদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রিম বর্ধিত বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পর্যায়ে শিক্ষকের পদোন্নতি বিষয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক কমিটি/বোর্ড কর্তৃক তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাজের মানের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রণীত সুপারিশের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের কোন বিধিনিষেধ থাকবে না এবং এরূপ শিক্ষকের চাকুরিকাল ৬৫ বৎসর পর্যন্ত হবে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের দায়িত্ব সরাসরি শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত থাকায় শিক্ষরেক জন্য প্রাইভেট পড়ানো/কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- সর্বস্তরে সকর শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিসি এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে। টিটিটিসিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। ভিটিটিআইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিগ্রি কোর্স খুলতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে প্রাক চাকরি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়া দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রার্থীর অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত শিক্ষকের জন্য দেশবিদেশের উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে আপগ্রেডিং ও আপডেটিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিয়োজিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করতে হবে।

- ছুটি ও প্রশিক্ষণজনিত কারণে মোট শিক্ষক পদের ১০% অধিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, শিল্পকারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা, শিখন-শিক্ষণে জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং কাজের মান ধারাবহিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কারিগরি ও অফিস কর্মচারীকে আধুনিক অফিস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি, রেকর্ডপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা

শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ

- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায় ক্রমান্বয়ে বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় ক্রেডিট-আওয়ারভিত্তিক কোর্স স্ট্রাকচার প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে ক্রেডিট আওয়ারের মান নির্ধারণ, অনুমোদন, বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অর্জিত ক্রেডিট/প্রায়র লার্নিং জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষায় ভর্তির জন্য গ্রহণযোগ্য করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে প্রচলিত ধারাবাহিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কারিগরি কর্মচারীর অব্যাহত যথোপযুক্ত স্টাফ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উন্নত করতে হবে।
- বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর জন্য দুই মাসব্যাপী শিল্পকারখানায়/কর্মক্ষেত্রে সংযুক্তির মেয়াদ কোর্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে দুই মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে এবং সার্বিকভাবে এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রম কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পরিবর্তনশীল চাহিদা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক নিরূপিত হতে হবে এবং তা নিয়মিতভাবে সংশোধিত, পরিমার্জিত করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে ৬০% ব্যবহারিক এবং ৪০% তাত্ত্বিক ক্লাসের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে হবে।

পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ

স্বশাসিত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য স্বশাসিত ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর একটি কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব

- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষককে ছুটি দিয়ে অথবা উপযুক্ত শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের পুস্তক লেখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপকরণ যেমন-পুস্তক, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, চার্ট, ইলাস্ট্রেশন, মডেল ইত্যাদি ডিজাইন উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রকাশনা, মাননিয়ন্ত্রণ, বিতরণ ও ব্যবহারিক নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশাসনিক কাঠামো

- কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার নীতিনির্ধারণ, সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং মাননির্ধারণ, উন্নয়ন, সমতাবিধান ও

সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বশাসিত ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এ কাউন্সিল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্রের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে গবেষণাকার্য পরিচালনা করবে। এ কাউন্সিল অবিলম্বে গঠন ও কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা সেল কাজ করবে।

- বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণ শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রাক-একনেক অনুমোদন এবং একনেক অনুমোদন করা ও পদ্ধতি বিলোপ করে প্রণীত শিক্ষানীতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক সম্পর্ক পরিবর্তন করে এবং শিক্ষা প্রশাসন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। সেজন্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে রূপান্তর করতে হবে। অধিদপ্তর প্রধান সরাসরি মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বধানে কাজ করবেন।
- বর্তমানে প্রচলিত জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতাপূর্ণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি এবং পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকের বাছাই ও নিয়োগ প্রদান পদ্ধতি বাতিল করে প্রস্তাববিত বিভাগের আওতায় গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডের মাধ্যমে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করত হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তাবায়ন প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষকের জন্য সুষ্ঠু নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধি প্রণয়ন করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি যথা : দাপ্তরিক, হিসাব, নিরাপত্তা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, কেনাকাটা ইত্যাদি কর্সম্পাদনের জন্য একজন উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের জন্য অন্য একজন উপাধক্ষ্য মোট দু'জন উপাধাক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য ব্যক্তি, সংস্থা, এনজিও বা প্রাইভেট উদ্যোগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শ এবং শিক্ষক কর্মচারীর সম্পূর্ণ বা আংশিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩

অ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারে কোন কোন দিকের জন্য সুপারিশ করেছে?
২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কিরূপ ছিল?
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশগুলো কী?
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশগুলি কী?
৫. শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ কী কী?
৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কী কী?

ইউনিট ১০

পরীক্ষা ব্যবস্থা : বর্তমান অবস্থা ও গতিধারা
[Examination Sytem : Present Situation and Trend]

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রিক হওয়ায় বর্তমানে এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। পরীক্ষা সর্বস্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সে কারণে পরীক্ষাকে উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। পরীক্ষা পরিচালনার সময় পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও প্রয়োগযোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অবস্থা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন পত্রের গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:
ক) বহি:পরীক্ষা ও অন্ত:পরীক্ষা; খ) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা; গ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরীক্ষা; ঘ) কার্য নির্ভর ও বাক্য নির্ভর পরীক্ষা এবং ঙ) সফলতা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় যে কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলো পরস্পর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। যেমন একটি পরীক্ষা আংশিক বহি: এবং আংশিক অন্ত: হতে পারে এবং বহি: অংশ কিছু লিখিত আর কিছুটা মৌখিক, কিছুটা কার্যনির্ভর আর কিছ বাক্য নির্ভর হতে পারে। কোন পরীক্ষা তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হবে যখন প্রমাণিত হবে যে এর উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রয়োগশীলতা সর্বাধিক। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় বহি:পরীক্ষা পদ্ধতির অস্বাভাবিক ও মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য রয়েছে। এই জাতীয় বিষয়বস্তু নির্ভর পরীক্ষাকে উদ্দেশ্যনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য করার সর্বাত্তক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া সফলতা, প্রবণতা, আগ্রহ, সহজাতবুদ্ধি, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির পরীক্ষা নিতে হবে। বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আঞ্চলিক দেশসহ বিশ্বের বহু দেশে প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে এবং তার মাধ্যমে সুফল পেতে শুরু করেছে। বর্তমান ইউনিটে সামগ্রিক পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল :

পাঠ-১০.১ : বাংলাদেশ বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও সংস্কারের সুপারিশ

পাঠ-১০.২ : পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিক গতি ধারা

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও সংস্কারের সুপারিশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরীক্ষা গ্রহণের মূল লক্ষ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কোন দিকটি পরিমাপের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে তা বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষার ধরন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, কমিটির প্রধান সুপারিশসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

পরীক্ষা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরীক্ষা পদ্ধতিকে অবিবেচ্ছদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত। সে কালের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান, মূল্যায়ন, সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হত এবং সেটি সমাজের সর্বজন কর্তৃক নন্দিত হত। পরবর্তীকালে শিক্ষার নানাবিধ প্রসার ও বিকাশের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরীক্ষা পদ্ধতির স্থলে জন্ম নিয়েছে আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি।

পাকভারত উপমহাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস বহুকালের পুরাতন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ অঞ্চলের পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রথম শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের পর ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা গ্রহণ করে। এ সময়ে পরীক্ষা পদ্ধতি আজও রয়ে গেছে।

পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য

পরীক্ষার মূল লক্ষ্য

পরীক্ষার মূল লক্ষ্য হল-(১) প্রণীত শিক্ষক্রমে আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয় শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন; (২) পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করে তার ঘাটতি নিরূপণ করা এবং ঘাটতি দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) সে সঙ্গে শিক্ষক তার পাঠদান পদ্ধতির উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার সংশোধন ও মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন; (৪) প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপযোগিতার সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাধন করা এবং (৫) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের যথার্থ স্বীকৃতি হিসেবে তাকে সনদপত্র প্রদান করা।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে কী পরিমাপে প্রাধান্য দেওয়া হয়?

জ্ঞান পরিমাপ করা হয়

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরীক্ষা কেন্দ্রিক অর্থাৎ পরীক্ষায় পাসের জন্য এদেশের শিক্ষাকার্যক্রম নিবেদিত। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি কেবল অর্জিত জ্ঞানই পরিমাপ করা হয়। দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের তেমন কোন ব্যবস্থা বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতিতে নেই।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা ও সংকট

দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলাত ও দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতার অভাব

বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই তিনটি ক্ষেত্র পরিমাপে অথবা মূল্যায়নে অপারগ। এছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের মধ্যে রয়েছে: পরীক্ষায় দুর্নীতি, নকল প্রবণতা, পরীক্ষা গ্রহণও পরিচালনায় প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। এছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারে জন্য বিভিন্ন কমিশন, কমিটি, টাস্ক ফোর্স এর সুপারিশ বাস্তবায়নের কার্যকর ও সর্বজন গৃহীত জাতীয় ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের সামগ্রিক অভাব রয়েছে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ধরন

কৃতিত্ব ও গতি অভীক্ষা

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান লিখিত রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ আদিকাল থেকে করা হচ্ছে এবং এর কিছু সুবিধাও ছিল, যেমন-যে শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন, তিনিই প্রশ্ন প্রণয়ন করতেন এবং তিনিই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতেন। তখন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে হাজার গুণ। সে সঙ্গে জ্ঞানের পরিধিও বেড়েছে। ফলে উদ্ভবিত হয়েছে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিষয়/পত্রে তিন ঘণ্টার ১০০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এসব পরীক্ষা কৃতিত্ব (Achievement Test) অভীক্ষা। কিন্তু এসব অভীক্ষায় যেহেতু সময় পূর্বনির্ধারিত থাকে এবং প্রশ্ন পত্রের উত্তরের কলেবর সময়ের তুলনায় বেশ দীর্ঘ (গবেষণার মাধ্যমে সময় ও প্রশ্ন নির্ধারিত নয় বরং অনুমানিক), সে কারণে এসব পরীক্ষা কার্যত Speed Test হিসেবে পরিগণিত। উপরোক্ত কারণে এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জন দারুণভাবে বিঘ্নিত করে।

পরিমাপ যন্ত্র হিসেবে একটি অভীক্ষায় (১) যথার্থতা (Validity), (২) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), এবং (৩) প্রয়োগশীলতা (Applicability) থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পুরোপুরি করা হয়না বলে ত্রুটি থেকে যায়।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ

অন্তঃ ও বহিঃ মূল্যায়ন গুরুত্বারোপ

(১) অন্তঃ ও বহিঃ মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সকল শিক্ষা কমিশন (জাতীয় কমিশন ১৯৭৪, ১৯৮৮) পরীক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটি (পরীক্ষা সংস্কার কমিটি ১৯৮০, ১৯৮৬) এবং সেকেণ্ডারী এডুকেশন ইন বাংলাদেশ এ সাব সেক্টর স্টাডি, ১৯৯২, পোস্ট প্রাইমারী এডুকেশন সেক্টর রিভিউ (১৯৯৩) বহিঃপরীক্ষার ওপর গুরুত্ব কমিয়ে অন্ত:পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপের সুপারিশ করে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ প্রচলিত বহি:পরীক্ষার পদ্ধতির স্থলে অন্ত: ও বহি:পরীক্ষায় সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করে। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি অন্ত:পরীক্ষায় উপর গুরুত্ব আরোপের সাথে সাথে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় যথাক্রমে শতকরা ৪০ ও ৬০ নম্বর বরাদ্দের সুপারিশ করে। পরীক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটি অন্ত:পরীক্ষায় শতকরা ২০ এবং বহিঃপরীক্ষায় শতকরা ৮০ নম্বর বরাদ্দের সুপারিশ করে। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বিত নম্বর এবং শাতংশিক স্তর পৃথকভাবে দেখানোর প্রস্তাব করে।

এই কমিটির সুপারিশ হলো, (ক) বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শুধু বহিঃপরীক্ষার দ্বারা মূল্যায়নের স্থলে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে; (খ) প্রতি পরীক্ষার বিষয়ে অন্ত: ও বহি:পরীক্ষায় যথাক্রমে শতকরা ২০ ও৮০ নম্বর বরাদ্দ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে অন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাশ করতে হবে এবং মার্কশীটে অন্তঃ ও

শতকরা ৫০; (গ) অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাশ করতে হবে এবং মার্কশীট অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার নম্বর পৃথক পৃথকভাবে দেখাতে হবে; (ঘ) অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার্থীদের ফরম ও অন্যান কাগজপত্রের সংগে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে এবং (ঙ) অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল একাডেমিক সুপারভিশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তদারকী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) পরীক্ষার প্রশ্নের গঠন ও প্রকৃতি

প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

উল্লেখিত নীতিমালার প্রেক্ষিতে পরীক্ষার গঠন ও প্রকৃতি নির্ণীত হবে। তবে এক্ষেত্রে আশু করণীয় হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(ক) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কমপক্ষে তিনটি বিষয়ে পাশ করলে পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে তাকে কেবল বাকী বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার্থী প্রথামবারের পরীক্ষার পর আরও দু'বার সুযোগ পাবে। তৃতীয়বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

(খ) প্রশ্নপত্র তিন প্রকারের প্রশ্ন থাকা আবশ্যক। যেমন রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক। বহিঃপরীক্ষায় রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নের শতকরা ৫০ নম্বর এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য শতকরা ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রত্যেকটি ভাগের জন্য পৃথক প্রশ্নপত্র থাকবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর করতে হবে।

(গ) প্রশ্নপত্রে স্মৃতি নির্ভর (Recall), লব্ধজ্ঞানের ব্যাপকতা (Comprehension), জ্ঞান প্রয়োগের নিপুণতা বা প্রায়োগিক দক্ষতা (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) ও মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয়ভাবে নতুন ধরনের এবং উপযোগী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সম্পর্কে গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হতে পারে, তবে ----বাক্যে নয়।

(চ) প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের বোর্ডের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সময় ও উপযুক্ত সম্মানী দিতে হবে এবং প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণও তাড়াহুড়ো করে প্রশ্ন প্রণয়ন না করে যথোপযুক্ত সময় দিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন।

পরীক্ষা প্রশাসন ও পরিচালনা

প্রশাসন ও পরিচালনার ধাপসমূহ

ক) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র সংখ্যানুপাতে থানা ও জেলা পর্যায়ে কেন্দ্র সংখ্যা নির্ধারিত হতে হবে। বর্তমানে পরিস্থিতিতে থানা পর্যায়ের নিচে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ) যে পরীক্ষা কেন্দ্রে একাধিক স্থান থাকবে সেখানে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দেবে। যদি কোথাও একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থাকে সেখানে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিদর্শক নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে।

গ) পরীক্ষাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সমাপ্ত করতে হবে। দীর্ঘ ছুটিকালীন সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। অথবা পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পৃথক পরীক্ষা হলের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গুচ্ছ করে দিতে হবে। এতে কম সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

ঙ) পরীক্ষার প্রাক্কালে কোন শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গুচ্ছ করে দিতে হবে। এতে কম সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

চ) শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বহিঃপ্রভাব মুক্ত। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সুশৃংখল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি এবং পুলিশ প্রহরা থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে পরীক্ষা ব্যবস্থা বহিঃপ্রভাবমুক্ত হয়।

পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ

লেটার গ্রেডিং এ পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ক) পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রচলিত মেধা তালিকা ও বিভাগ (যেমন ১ম ২য় ও ৩য় বিভাগ) প্রথার প্রাধান্য বাতিল করে সকল বিষয়ের নম্বর মিলিয়ে পাশের পরিবর্তে বিষয় ভিত্তিক পাশ বা লেটার (এ.বি.সি ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে।

খ) প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর আদর্শ নম্বর (Standard Score) দেখিয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যেতে পারে।

গ) শিক্ষার্থী কমপক্ষে তিনটি বিষয়ে পাশ করলে পরবর্তী দু'বৎসরে তাকে বাকী বিষয়গুলো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

ঘ) ফলাফল নির্ধারণ ও ফল প্রকাশে কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহার হবে।

পরীক্ষার উত্তর পত্র মূল্যায়ন

ক) পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য 'স্পট চেকিং' এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য প্রতিটি জেলা শহরে কোন কেন্দ্রীয় স্থানে উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীদের একত্রে বসিয়ে ঐ জেলায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এই ব্যবস্থা চালু আছে।

খ) শিক্ষার্থীর অবিরত মূল্যায়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য "কিউমুলেটিভ রেকর্ড" বা "ক্রয়পুঞ্জিত মূল্যায়ন পত্র" এর প্রচলন করতে হবে।

প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষা ও মডারেটরদের প্রশিক্ষণ

পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণদান

ক) মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার জন্য প্রশ্নপ্রণেতা, মডারেটর ও উত্তরপত্র মুল্যায়নকারীদের (প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সাহায্যে মুল্যায়ন সংক্রান্ত ধ্যান ধারণার সাথে প্রশ্নপ্রণেতা, মডারেটর ও পরীক্ষকদের পরিচিতি করাতে হবে।

গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকার পেশাগত প্রশিক্ষণ (যেমন বি এড ও এম এড) আবশ্যিক করতে হবে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোকে পেশাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ

ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে একটি পেশাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বোর্ডের বাইরে থেকে পেশায় অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে বোর্ডের উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না করে বোর্ডের মধ্যে থেকেই যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রমোশন দিতে হবে।

খ) কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বোর্ডের কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন করতে হবে।

গ) আন্তঃশিক্ষা বোর্ড বদলির ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যালয়-১০.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে ঢাকায় শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল?
২. প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা কী?
৩. অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার জন্য সুপারিশকৃত নম্বর বণ্টন উল্লেখ করুন ।
৪. বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশকৃত প্রশ্নের ধরন কী কী?
৫. পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতি লিখুন ।
৬. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের জন্য শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশ কী কী?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষার লক্ষ্য ও সমস্যা বিবৃত করুন ।
২. পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ কী কী?
৩. প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন ।

পাঠ-১০.২ পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিক গতিধারা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরীক্ষা সম্বন্ধীয় কতকগুলো বহুল ব্যবহৃত পারিভাষিক পদের ধারণা বিবৃত করতে পারবেন;
- "জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭" পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে যে সুপারিশ করেছে সেগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারবেন এবং
- পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে এতদাঞ্চলের বর্তমান চিন্তা-ভাবনা উল্লেখ করতে পারবেন।

পরীক্ষা সম্বন্ধীয় পারিভাষিক পদের ধারণা

কোন বিষয়ে এজন বা একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানার জন্য আমরা পরিমাপ, মূল্যায়ন ইত্যাদি করে থাকি। এরূপ পরিমাপ ও মূল্যায়ন আমরা পরীক্ষা, অভীক্ষা, কৃতিত্ব অভীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ পরিমাপ ও মূল্যায়নের সঙ্গে কতকগুলো পারিভাষিক পদ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত করা হল :

পরীক্ষা

পরীক্ষা : কোন বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর উক্ত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের মাত্রা নিরূপণের জন্য যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাই পরীক্ষা।

অভীক্ষা

অভীক্ষা : কোন বিষয়ে একজন/একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা দক্ষতা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একগুচ্ছ প্রশ্ন কিংবা কাজের নামই অভীক্ষা, যাকে ইংরেজিতে Test বলে।

কৃতিত্ব

কৃতিত্ব অভীক্ষা : একজন/একদল শিক্ষার্থী পঠিত কোন বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা ও কার্য সম্পাদন কুশলতা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই পদ্ধতিই হল কৃতিত্ব অভীক্ষা।

পরিমাপ

পরিমাপ : একজন শিক্ষার্থী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কি পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছে তার সংখ্যাগত পরিমাণ নিরূপণ প্রক্রিয়াই হল পরিমাপ। মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ গ্রোনল্যাণ্ড পরিমাপ বলতে কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণ রয়েছে তার সংখ্যাগত বিবরণকে বুঝিয়েছেন।

মূল্যায়ন

মুল্যায়ন : কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য কতটুকু শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণের নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতিই হল সাধারণ কথায় মূল্যায়ন।

মূল্যায়নকে একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে শিক্ষার্থীর সর্বদিক, যেমন স্বাস্থ্য, আচার আচরণ, প্রকাশ ক্ষমতা, মূল্যবোধ, অভিযোজন ক্ষমতা, পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয়সাধন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিই মুল্যায়ন।

পরীক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭ এর সুপারিশ

প্রাথমিক স্তর

১. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু থাকতে পারে।

২. শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বৎসর সাময়িক ও বার্ষিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ

ছাড়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে শতকরা ৩০ জন বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে যা বর্তমানে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে চালু আছে। বৃত্তি পরীক্ষা হবে পঞ্চম শ্রেণীর শেষে। অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. প্রাথমিক স্তরের কোন শ্রেণীতেই শিক্ষক সমিতি বা অন্য কোন সমিতি কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হবে না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষই এসব প্রশ্ন প্রণয়ন করবে এবং স্কুলগুলোকে সেখানে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৪. যে সকল শিক্ষার্থী অস্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেনা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তির সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। উক্ত সনদপত্রে শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ উল্লেখ করতে হবে। এ সনদপত্র শিক্ষার্থীর চুড়ান্ত ফল হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. পরীক্ষার্থীকে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর

১. দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। কোন শিক্ষার্থী দশম শ্রেণীর শেষে প্রথম পর্ব পরীক্ষায় যেসব বিষয়ে অকৃতকার্য হবে এগুলো দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা দিতে পারবে। দুই পরীক্ষায় ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কেউ দশম শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্বের পর পড়াশুনা চালাতে না পারলে তাকে বোর্ড থেকে নম্বরপত্র দেওয়া হবে এবং স্কুল থেকে স্কুল ত্যাগের সনদ দেওয়া হবে।

২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীকে ঐ বিষয়ে আর মাত্র একবার পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য কোন অন্তবর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না। অনুরূপ সুযোগ অন্যান্য স্তরের পাবলিক পরীক্ষাও দিতে হবে।

৩. কোন পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রথম মূল পরীক্ষা এবং পরবর্তী পরীক্ষায় (যে পরীক্ষায় একটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে) প্রাপ্ত গ্রেড একত্র করে চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয় করা হবে।

৪. পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না। গ্রেড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জিপিএ (GPA) পদ্ধতি চালু করা হবে। কোন বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী ৪০% এর নিচে নম্বর পেলে তাকে অকৃতকার্য বলে গণ্য করা হবে। গ্রেড নির্ণয়ের মান নিম্নরূপ হবে।

A+ = ৯০ তার উর্ধ্বে

A = ৮০% এর উর্ধ্বে ৯০% এর নিচে

B = ৭০% এর উর্ধ্বে ৮০% এর নিচে

C = ৫৫% এর উর্ধ্বে ৭০% এর নিচে

D = ৪০% এর উর্ধ্বে ৫৫% এর নিচে

৫. মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ৮০% এর মধ্যে রচনামূলক ৩০% সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৩০%

এবং নৈর্ব্যক্তিক ২০%। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃপরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক হার বা তার কাছাকাছি হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে। তবে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড নির্ণয় করা হবে, পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন মেধা তালিকা থাকবে না।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা থেকে ভিন্নধর্মী। সেজন্য এর মূল্যায়ন পদ্ধতিও ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় হাতে কলমে শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর তত্ত্বীয় বিষয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতার একান্ত প্রয়োজন আছে। ছাত্রছাত্রী যদি কোন বিষয়ের পাঠ প্রক্রিয়ায় কিছু ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লাসসমূহের পাঠ তার কাছে অনেকাংশে অবোধ্য থাকবে। এ কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে এ বিষয়টি বিবেচনা করে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে তা ক্রেডিট ও কোর্স পদ্ধতির সংমিশ্রণ এবং এর সিলেবাসসমুহ ক্রেডিট পদ্ধতি ভিত্তিক। ছয় মাসের একটি সেমিস্টারে ৫/৭ টি বিষয়ে ২০ থেকে ২৪ ক্রেডিটের একটি কোর্স অধ্যয়ন করে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে পড়ার সুযোগ পায়। প্রথম থেকে চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত দুইয়ের অধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ছাত্রছাত্রীকে সেমিস্টারের সকল বিষয় পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয়। ক্রেডিট পদ্ধতিতে এ নিয়ম সঠিক নয়। তবে পঞ্চম পর্বে (প্রথম পাবলিক পরীক্ষা) যে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ষষ্ঠ পর্বের (দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা) সঙ্গে বা পরবর্তী পঞ্চম/ষষ্ঠ পর্বে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরীক্ষা সম্বন্ধীয় পারিভাষিক পদগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশমালা কী?
৩. প্রস্তাবিত পরীক্ষায় কত নম্বর পেলে অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে?
৪. বহিঃপরীক্ষার ধরণ মান বণ্টনসহ উল্লেখ করুন।
৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় সেমিস্টার বিভাজন কী কী?
৬. উপলব্ধি সম্বন্ধীয় গুণগত ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক স্তরের সংস্কারের সুপারিশসমূহ আলোচনা করুন।
২. পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের নবতর চিন্তা ভাবনার কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত বিবৃত করুন।